গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৭ বর্ষ ২৫ সংখ্যা ৩১ জানুয়ারি - ৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ Web: https://ganadabi.com আট পাতা মূল্য ঃ ৩ টাকা

লাখো মানুষের অভিনন্দনে সমৃদ্ধ মহামিছিল

২১ জানুয়ারি মহামিছিলের নেতৃত্বে সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ

এ মিছিল আগামীর স্বপ্নের

২১ জানুয়ারি, রানি রাসমণি রোডে তখন সমুদ্র-গর্জনের মতো আছড়ে পড়ছে প্রতিবাদী মানুষের স্বর। স্রোতের মতো মানুষ। সামনে রক্তিম আকাশ। ধর্মতলার মোড়ে মহান নেতা লেনিনের মূর্তির গায়েও সেই রক্তিম আলোর ছোঁয়া। শপথে, সংগ্রামে উদ্দীপ্ত মানুষের চেতনায় রাঙা হয়ে উঠেছে কলকাতার রাজপথ। এরপর এই অগণিত মানুষ, মিছিল শেষে ফিরে যাবে যে যার জায়গায়। তারা জানে, এখানেই শেষ নয়। যে লড়াই শুরু হয়েছে, তার দীর্ঘ পথ বাকি এখনও। যে দাবি উত্থাপিত হয়েছে, কালই তা পূরণ হবার নয়। যে সংগঠিত চক্র খুন করল অভয়াকে, প্রমাণ লোপাট, সত্যকে ধামাচাপা দেওয়ার শত চেষ্টা তারা করলেও, যত বড় ধামাই হোক, সবটা তারা ঢাকা দিতে পারেনি। তারা আইন, আদালত, পুলিশ, প্রশাসন, সিবিআই-এর মতো গোয়েন্দা সংস্থা, সবকিছুকে কিনতে পারলেও, কিনতে পারেনি মানুষের বিবেককে। এ মিছিল জানে, প্রকৃত দোষীরা কালই ধরা পড়ে শাস্তি হয়তো পেয়ে যাবে না। মজুতদার-ফাটকাবাজ-কালোবাজারিদের কারসাজিতে বেড়ে চলা জিনিসের দাম কালই কমবে না। দুর্নীতির কারবারিরা দুর্নীতি বন্ধ করে রাতারাতি সাধু হয়ে যাবে না। এ জন্য পাড়ি দিতে হবে আরও অনেক

চারের পাতায় দেখুন

বিচারকের রায় পর্দা ফাঁস করে দিয়েছে

কিছু মানুষের বিশ্বাস ছিল, আর জি কর ঘটনার তদন্তের ভার যখন রাজ্য পুলিশের হাত থেকে সিবিআইয়ের হাতে গেছে তখন দোষীরা ধরা পড়বেই। সিবিআইয়ের হাত থেকে কেউই রেহাই পাবে না।

কিন্তু দিন যত গেছে আশা হতাশায় পরিণত হয়েছে। ৯০ দিন পরেও হাসপাতালের পূর্বতন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ এবং টালা থানার তৎকালীন ওসি অভিজিৎ মণ্ডলের বিরুদ্ধে চার্জশিট জমা দিতে পারেনি সিবিআই। এই মামলায় শিয়ালদহ আদালতের বিচারপতি অনির্বাণ দাস তাঁর রায়ের ছত্রে ছত্রে সিবিআই এবং পুলিশের তদন্তে চরম গাফিলতির উল্লেখ করে গেছেন। সিবিআই যে নতুন করে তদন্তের কোনও রিপোর্টই আদালতে জমা দেয়নি তা-ও তিনি বলেছেন। কলকাতা পুলিশের তদন্তকারী অফিসার এবং টালা থানার ত্রুটি ও পদে পদে ব্যর্থতার কথাও তিনি তাঁর রায়ে তুলে ধরেছেন। পুলিশের দায়সারা মনোভাবের জন্যই মর্গ থেকে শুরু করে ঘটনাস্থল এবং সন্দেহভাজনদের নানা রকমের নমুনা যতটুকু সংগ্রহ করা হয়েছে তা-ও অত্যন্ত হেলাফেলায়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে নমুনাই সংগ্রহ করা হয়নি।

হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের প্রথম থেকেই ঘটনাকে আড়াল করার চেষ্টার কথা বিচারপতি তাঁর রায়ে উল্লেখ করে গেছেন। বলেছেন, ওই চিকিৎসক-ছাত্রীর 'আত্মঘাতী' হওয়ার গল্প বাতাসে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছিল। রায়ে বলা হয়েছে ঘটনাস্থলে শুরু থেকে পুলিশের নমুনা সংগ্রহ পর্যন্ত আগাগোড়া উপস্থিত ছিলেন এই ঘটনায় তথ্যপ্রমাণ লোপাট ও বৃহত্তর ষড়যন্ত্রের অন্য মামলায় ধৃত তৎকালীন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ। অধ্যক্ষ এবং সুপার ধর্ষণ এবং খুনের কথা শুনেও তা পুলিশকে সরকারি ভাবে জানাননি। রায়ে তিনি বলেছেন, মনে হচ্ছে যে তাঁরা কিছু ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। এবং তাঁদের কর্তব্যে গাফিলতি ছিল।

ধর্ষণ ও খুনের এমন একটি মারাত্মক ঘটনাকে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে বলে বিচারক তাঁর রায়ে স্পষ্ট করে উল্লেখ করেছেন। অথচ সন্দীপ ঘোষ এবং অভিজিৎ মণ্ডলের বিরুদ্ধে সিবিআই চার্জশিট পর্যন্ত জমা দিল না! তা হলে কী এমন

দুয়ের পাতায় দেখুন

বিচারকের রায়েই পর্দা ফাঁস

একের পাতার পর

ঘটল যে সিবিআই এ ভাবে তাঁদের জামিন পাওয়ার সুযোগ করে দিল। কার নির্দেশে সিবিআই এই কাজ করল? এর পিছনে গভীর ষড়যন্ত্র এবং কেন্দ্র-রাজ্যের যোগসাজশের যে অভিযোগ প্রথম থেকেই আন্দোলনরত জুনিয়র ডাক্তার এবং জনসাধারণ করে আসছিলেন তার সত্যতাই বিচারকের পর্যবেক্ষণে প্রমাণিত হল। তা হলে এমন তদন্তের উপর ভিত্তি করে বিচারকে কেন প্রহসন বলা হবে না? ধৃত সিভিক ভলান্টিয়ার সঞ্জয় রায় কি এতটাই প্রভাবশালী যে তার অপরাধ ঢাকতে কেন্দ্র রাজ্য দুই সরকারই এত তৎপর হল? বুঝতে আর কারও অসুবিধা নেই যে আরও অনেক বড় বড় মাথাকে বাঁচাতেই তদন্তের নামে পুলিশ-সিবিআইয়ের এই প্রহসন। এই তদন্তের ভিত্তিতে বিচারও বাস্তবে প্রহসন ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না।

প্রশাসনের অন্যান্য ক্ষেত্রগুলির মতো পুলিশেরও দল-মত নির্বিশেষে নিরপেক্ষ ভাবে কাজ করা সাংবিধানিক দায়িত্ব। কিন্তু সব সরকারই পুলিশকে দলদাস হিসাবে ব্যবহার করে। আর জি করের ঘটনাতেও পুলিশ রাজ্য সরকারের নেতা-মন্ত্রীদের নির্দেশ মতো সত্য চাপা দিতে প্রথম থেকেই হাসপাতাল প্রশাসনের সহযোগী হিসাবে প্রমাণ লোপাটের কাজে নেমে পড়ে। অন্য দিকে প্রবল গণবিক্ষোভকে স্তিমিত করতে এবং জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করতে পুলিশ তড়িঘড়ি সঞ্জয় রায়কে গ্রেপ্তার করে এবং তাকেই একমাত্র ধর্ষক ও খুনি বলে জনসমক্ষে প্রচার করতে থাকে। কিন্তু যতটুকু তথ্য-প্রমাণ তখনই প্রকাশ পায় তাতে মানুষের সাদা চোখেই পুলিশের এই মিথ্যাচার ধরা পড়ে যায়। আসল দোষীদের চিহ্নিত করে শাস্তির দাবিতে আন্দোলন ছড়াতে থাকে বাংলার এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে, ছড়ায় দেশ জুড়ে। এই রকম অবস্থায় তদন্তের দায়িত্ব পায় সিবিআই।

কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআইয়ের অতীত থেকেই স্পষ্ট যে তার স্বাধীন সত্তা বলে কিছু অবশিষ্ট নেই। বারবার দেখা গেছে তারা চলে আসলে পিছনে থাকা সুতোর টানে। যা দেখে বিভিন্ন মামলায় বিচারপতিরা তাকে খাঁচার তোতা বলে অভিহিত করেছেন। আর জি করের ঘটনায় তদন্তের ক্ষেত্রেও সিবিআই নিজেদের সেই খাঁচার তোতা বলেই প্রমাণ করল। তাই তাঁরা নিজেরা যতটুকু তদন্ত করেছে তার রিপোর্টটুকুও আদালতে জমা দিতে পারল না। তদন্তের নামে পুলিশের যে ছেলেখেলার বিরুদ্ধে মানুষ ক্ষোভে ফেটে পড়েছিল সেই পুলিশি রিপোর্টেই তারা স্ট্যাম্প দিয়ে দিল।

পুলিশ এবং সিবিআই উভয়েরই তদন্তের বিশ্বাসযোগ্যতা জনমনে শূন্যে নেমে এসেছে বুঝেই বোধহয় মুখ্যমন্ত্রী তড়িঘড়ি বলেছেন, ‘‘আমাদের হাতে তদন্ত থাকলে আরও আগেই ফাঁসির রায় করিয়ে দিতে পারতাম।’’ বিচারক তাঁর রায়ে বলছেন, তদন্তকারীরা যা তথ্যপ্রমাণ সামনে এনেছেন তাতে তিনি এই ঘটনাকে বিরলের মধ্যে বিরলতম হিসেবে গণ্য করছেন না। অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে ফাঁসির রায় দেওয়া যায় না। তারপরও মুখ্যমন্ত্রীর মতো একটি সাংবিধানিক পদে থাকা কেউ কী করে বলতে পারেন— ‘ফাঁসির রায় করিয়ে দিতে পারতাম’! দেখেশুনে মনে হয়, ঘটনার সত্য উদঘাটনের থেকেও যে কোনও প্রকারে কাউকে একটা ফাঁসিতে চড়ানোই মুখ্যমন্ত্রীর আসল উদ্দেশ্য। প্রতি পদে পুলিশের যে গাফিলতি এবং তথ্য-প্রমাণ লোপাটের স্পষ্ট প্রমাণ বিচারকের রায়ে উঠে এসেছে তাতে যারপরনাই লজ্জিত না হয়ে মুখ্যমন্ত্রী হঠাৎ সঞ্জয়ের ফাঁসির দাবি করলেন কেন? সেন্ট্রাল ফরেনসিক সায়েন্স ল্যাবরেটরির রিপোর্ট সহ সমস্ত তথ্যপ্রমাণে যখন একাধিক ব্যক্তি জড়িত থাকার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে তখন একজনকেই দোষী সাব্যস্ত করে তাকেই চরম শাস্তি দেওয়ার কথা বলা কি আসলে যে কোনও উপায়ে এই ভয়ঙ্কর ঘটনার সত্য উদঘাটনের দায়িত্ব থেকে হাত ধুয়ে ফেলার চেষ্টা নয়?

আসলে এই ধর্ষণ-খুনের ঘটনায় দোষীদের বাঁচাতে রাজ্য সরকার এবং তার পুলিশ বাহিনীর ঘৃণ্য ভূমিকা দেশের মানুষের কাছে একেবারে বেআব্রু হয়ে গেছে। ধিক্কারে ফেটে পড়েছে মানুষ। এই গণবিক্ষোভ থেকে নিজেদের আড়াল করতেই মুখ্যমন্ত্রীর এমন সাধু সাজার চেষ্টা। এর পিছনে রয়েছে মানুষকে আবার বিভ্রান্ত করার প্রয়াস যে, তাঁরা ধর্ষণ-খুনের ঘটনায় সম্পূর্ণ আপসহীন। তাই ফাঁসির মতো চরম সাজাই তাঁরা দাবি করছেন। ভাবটা এমন যেন, কী করা যাবে, বিচারক তো মৃত্যুদণ্ড না দিয়ে আমৃত্যু জেলের রায় দিলেন! অর্থাৎ দোষীর ফাঁসি না হোক, যাবজ্জীবন কারাদণ্ড তো হয়েছে! এরপর নিশ্চয় দেশবাসীর আর ক্ষোভের কোনও কারণ থাকল না এবং এই পর্ব এখানেই সমাপ্ত হল। আর কেউ সরকার এবং প্রশাসনের দিকে আঙুল তুলবেন না। শান্তি শান্তি শান্তি!

আসলে রাজ্য জুড়ে যে বিরাট দুর্নীতিচক্র মুখ্যমন্ত্রী এবং তার দল ও প্রশাসনের পৃষ্ঠপোষণায় রমরম করে চলছে সেই চক্রের কোনও একটি শৃঙ্খল ভেঙে পড়লে গোটা চক্রটাই ভেঙে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। সেই দুর্নীতিচক্রেরই অন্যতম অংশ হাসপাতালগুলির দুর্নীতি— আর জি করের দুর্নীতিও যার অংশ— যার বিরোধিতা করতে গিয়েই চিকিৎসক-ছাত্রীর এমন মর্মান্তিক পরিণতি। কান টানলে মাথা এসে যাওয়ার সম্ভাবনা এখানে প্রবল। তাই দোষীদের আড়াল না করে মুখ্যমন্ত্রীর উপায় নেই। কিন্তু তাঁর এই সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হয়ে যেত যদি সিবিআই তার দায়িত্ব ঠিক ঠিক মতো পালন করত। কেন সিবিআই তা করল না? কেন্দ্রে বিজেপি সরকারের শাসন তো রাজ্যের তৃণমূল সরকারের বিরোধী বলে পরিচিত। রাজ্যের বিজেপি নেতারাও তৃণমূল সরকারের দুর্নীতি-খুন-ধর্ষণের রাজনীতির বিরুদ্ধে মাঝে মাঝেই হুঙ্কার ছাড়েন। নির্বাচনের আগে প্রায়ই ছুটে আসেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রীরাও। তা হলে বিজেপি সরকার এবং তার নেতা-মন্ত্রীরাই বা সিবিআইয়ের এমন ভূমিকায় মুখে কুলুপ আঁটলেন কেন?

কেন্দ্র ও রাজ্য উভয় দলেরই ধারণা সাধারণ মানুষ বোকা। তাঁরা যা বোঝাবেন মানুষ তা-ই বুঝবেন। ক্ষমতার দম্ভ সব শাসককেই এমন সিদ্ধান্তের দিকে ঠেলে নিয়ে যায়। তাঁরা মনকে চোখ ঠারেন। বাস্তবে মানুষের বুঝতে অসুবিধা হয়নি যে উভয় শাসক দলই ভয় পাচ্ছে গণআন্দোলনকে, সেই আন্দোলনে মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত এবং সক্রিয় যোগদানকে। এই আন্দোলন যদি ন্যায়বিচারের দাবি আদায় করতে পারে তবে সারা দেশে তা নজির তৈরি করবে। শাসকদের সমস্ত রকম অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাবি আদায়ের হাতিয়ার হিসাবে মানুষ গণআন্দোলনকেই ব্যবহার করবে। রাজ্যে রাজ্যে বিশেষত বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে দুর্নীতি-অপশাসন ছাড়াও মহিলাদের উপর খুন-ধর্ষণ যে ভাবে মাত্রাছাড়া আকার নিচ্ছে তাতে সেই রাজ্যগুলিতেও এই আন্দোলনের ঢেউ উঠবে। বিজেপি নেতা-মন্ত্রীদের সেখানেই ভয়। তাতে যদি

তৃণমূল নেতৃত্ব জনরোষ থেকে নিজেদের আড়াল করার কিছুটা সুবিধা পেয়েও যায় তাতে তাঁদের কিছু যায় আসে না। পুলিশ-সিবিআই-বিচারব্যবস্থার বিশ্বাসযোগ্যতা যদি লোকচক্ষে তলানিতে গিয়েও ঠেকে তাতেও পরোয়া নেই। বাস্তবে কেন্দ্র ও রাজ্যের এই হিসাবই কাজ করছে তদন্তের এই নজিরবিহীন প্রহসনের পিছনে।

কেন্দ্র-রাজ্য সব সরকারই চায় দেশের সাধারণ মানুষ যেন নিজেদের দাবিতে সংগঠিত না হয়, নিজেদের জীবনের সংকট নিয়ে সোচ্চার না হয়। তারা যেন কায়েমি স্বার্থের রক্ষক রাজনৈতিক দলগুলির উপরই নির্ভরশীল হয়ে থাকে। পুঁজিপতি শ্রেণির সেবাদাস, দুর্নীতিগ্রস্ত, আত্মসর্বস্ব নেতাদের বিরুদ্ধে আঙুল না তোলে।

কিন্তু সাধারণ মানুষ, যাঁরা এতবড় একটা অন্যায়ের বিরুদ্ধে শাসক দলগুলির আঁতাত চোখের সামনে দেখলেন তাঁরা কি চুপ করে থাকবেন? নীরবে এতবড় একটি অন্যায় মেনে নেবেন? এই অন্যায় যদি চলতে থাকে তবে নিজের সন্তানও যে নিরাপদ নয়— এমন ভয়ঙ্কর সম্ভাবনার কথা জেনেও চুপ করে থাকবেন? না, চুপ করে তাঁরা থাকবেন না। তাই তো তাঁরা দলে দলে শয়ে শয়ে হাজারে হাজারে রাস্তায় নেমে এসেছেন। রাত জেগেছেন। মিছিল করেছেন। রাস্তা অবরোধ করেছেন। ধর্মঘট করেছেন। আর এতেই ভীত শাসকরা। কিন্তু সংগঠিত শাসক শক্তি চাইলেই এমন আন্দোলনকে স্তব্ধ করতে, দমন করতে পারবে না। সাধারণ মানুষের নজরে তাদের সমস্ত ষড়যন্ত্র ধরা পড়বেই এবং আরও প্রবল তেজে আন্দোলনে এগিয়ে আসবে তারা।

বিচারকের প্রশ্ন

- নির্যতিতার যৌনাঙ্গে ধর্ষকের বীর্য মেলেনি।
- স্তনবৃন্ত থেকে প্রাপ্ত নমুনায় অন্য এক মহিলার ডিএনএ-রও উপস্থিতি।
- ময়না তদন্তের নমুনা সংগ্রহের পদ্ধতি ত্রুটিপূর্ণ।
- লালবাজারের তদন্তকারী অফিসার রূপালি মুখোপাধ্যায় তদন্তে ব্যর্থ, কাজেও ত্রুটি।
- দেহ উদ্ধারের পর ঘটনাকে গুরুত্ব দেয়নি টালা থানা।
- থানায় জেনারেল ডায়েরিতে ‘বেআইনি’ ভাবে তথ্য নথিবদ্ধ করেছেন এসআই সুব্রত চট্টোপাধ্যায়। একই কাজ করেছেন এসআই সৌরভকুমার ঝা-ও।
- কারও নির্দেশে এই কাজ করেছিলেন সুব্রত। কিন্তু কার নির্দেশ, তা কোর্টে জানাননি।
- সিবিআইয়ের তদন্তকারী অফিসার সীমা পাহুজা তদন্তের নির্দিষ্ট অগ্রগতি করেননি। কলকাতা পুলিশের তথ্য বিশ্লেষণ করে ঘটনাক্রম সাজিয়ে পেশ করেছেন।
- নিজেদের দায় ঝাড়তে ঘটনাকে গোড়াতেই ‘আত্মহত্যা’ বলে প্রমাণের চেষ্টা করেছিলেন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ।
- ধর্ষণ এবং খুনের ঘটনা জেনেও হাসপাতালের তৎকালীন অধ্যক্ষ এবং সুপার পুলিশকে জানাননি।
- হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের আচরণ দেখে মনে হয়, তাঁরা কিছু ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন।
- কলকাতা পুলিশ এবং সিবিআইয়ের তদন্তে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের গাফিলতি সম্পর্কে কিছুই বলা হয়নি।

(সূত্র ঃ বিচারক অনির্বাণ দাসের রায়ের প্রতিলিপি)

(২২ জানুয়ারি, ’২৫-এর আনন্দবাজার পত্রিকা থেকে)

বিদ্যুৎ গ্রাহকদের রাজ্য সম্মেলন

বর্ধিত ফিক্সড চার্জ ও মিনিমাম চার্জ প্রত্যাহার, সিইএসসি-তে এফপিপিএএস-এর নামে বাড়তি টাকা নেওয়া বন্ধ, গ্রাহকদের লুট করার যন্ত্র ‘স্মার্ট প্রি-পেইড মিটার’ বাতিল, জনবিরোধী বিদ্যুৎ বিল ২০২২ প্রত্যাহার প্রভৃতি দাবিতে রাজ্য বিদ্যুৎ গ্রাহকদের সম্মেলন

১ ফেব্রুয়ারি ঃ প্রকাশ্য সমাবেশ, বেলা ১টা, বারুইপুর রেল মাঠ

২ ফেব্রুয়ারি ঃ প্রতিনিধি অধিবেশন, বারুইপুর রবীন্দ্র ভবন

বাংলাদেশের সংবিধান সংস্কার নিয়ে আলোচনায় বাসদ (মার্ক্সবাদী)-র অভিমত

বাংলাদেশের তত্ত্বাবধায়ক সরকার নতুন সংবিধান রচনার ঘোষণা দিয়ে পুরনো সংবিধানের নানা বিষয় সংস্কার করার প্রস্তাব করেছে এবং এ নিয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও সংগঠনের সাথে মতবিনিময় করছে। এ প্রসঙ্গেই বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্ক্সবাদী)-র পক্ষ থেকে যে মতামত ব্যক্ত করা হয়েছে, সেটি লিখিতভাবে আমাদের কাছে তাঁরা পাঠিয়েছেন। আমরা এ দেশের মানুষের জ্ঞাতার্থে সেটি প্রকাশ করছি।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ও জাতীয় নাগরিক সমাজের খসড়া ঘোষণাপত্রটি আনুষ্ঠানিকভাবে আমাদের দল বাসদ (মার্ক্সবাদী) বা জোটকে না দিলেও এটা ইতোমধ্যেই বিভিন্ন মাধ্যমে প্রকাশিত। গত ১৬ জানুয়ারি সরকারের পক্ষ থেকে আয়োজিত এক সর্বদলীয় বৈঠকে আমাদের দলকে আমন্ত্রণ জানানো হয় এবং আরেকটি ঘোষণাপত্র পাঠানো হয়।

এই দু'টি ঘোষণার বেশ কিছু অংশের সাথে আমরা একমত থাকলেও, এখানে বিভিন্ন বিষয়কে যেভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে সেটা অনেক ক্ষেত্রে অসম্পূর্ণ, বেশ কিছু জায়গায় ভুল এবং খানিকটা বিভ্রান্তিকর বলে আমাদের মনে হয়েছে। এই দু'টি ঘোষণাপত্রের প্রধান কয়েকটি দিক নিয়ে আমরা কিছু আলোচনা রাখতে চাই, যাতে এ সম্পর্কিত আলাপ-আলোচনা ও তর্ক-বিতর্কের মাধ্যমে সত্যে উপনীত হওয়ার পথটি প্রশস্ত হয়। আমরা নিশ্চিত যে তারা এই বক্তব্যটি ভেবে দেখবেন। সময়াভাবে ও সকলের পড়ার সুবিধার্থে আমাদের বক্তব্য বিস্তারিত না করে সংক্ষিপ্ত আকারে রাখছি। (পরে আমরা এ বিষয়ে বিস্তারিত মতামত রাখতে পারি)

বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস

১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সমগ্র জনগণের দীর্ঘ সংগ্রামের একটা পর্যায় শেষ হয় এবং ১৪ আগস্ট স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে পাকিস্তান আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু পাকিস্তান সৃষ্টির পর পূর্ব পাকিস্তান মূলত পশ্চিম পাকিস্তানি পুঁজিপতি গোষ্ঠীর কাঁচামাল ও পুঁজি সংগ্রহের উপনিবেশ হিসেবে ব্যবহৃত হতে থাকে। এ অঞ্চলের জনগণ চূড়ান্ত শোষণের শিকার হয়। তৎকালীন পাকিস্তানের প্রায় ৬০ শতাংশ মানুষ পূর্ব পাকিস্তানের অধিবাসী হলেও, এ অংশে ১৯৫০-'৫১ থেকে ১৯৫৪-'৫৫ সালে কেন্দ্রীয় সরকারের উন্নয়ন বাজেটে বরাদ্দ ছিল মাত্র ২০ শতাংশ। এই নির্মম শোষণ পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ নীরবে মেনে নেয়নি। পূর্ব পাকিস্তানের উপর এই নির্মম শোষণের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের বিরাট ভৌগোলিক দূরত্ব এবং পাকিস্তানের দুই অংশের ভাষা ও সংস্কৃতিগত পার্থক্য। ফলে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ এই শোষণ ও জুলুমের বিরুদ্ধেপ্রতিবাদে ফেটে পড়ে। সালাম, বরকত, রফিক, জব্বারের রক্তস্নাত বাহান্নর ভাষা আন্দোলন, মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের বিজয়— এই আন্দোলনগুলি মানুষের চিন্তার মধ্যে প্রথম স্বাধিকারের ধারণা নিয়ে আসে। ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা নির্বাচনী কর্মসূচির মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের একটা ধারণা মূর্ত হয়। উল্লেখ্য যে, শ্রমিক-কৃষকদের মধ্যে অসম্ভব জনপ্রিয় জননেতা মওলানা ভাসানী এই পর্ব থেকে একটার পর একটা গণআন্দোলন সংগঠিত করেছেন, যা শেষ পর্যন্ত সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে পরিণতি লাভ করেছিল। কিন্তু ইতিহাসে ওঁর এই ভূমিকার কথা সঠিকভাবে তুলে ধরা হয়নি। ১৯৭০ সালের ২০ ও ২১ নভেম্বর খুবই অসুস্থ অবস্থায় মওলানা ভাসানী ঘূর্ণিঝড়ে ও জলোচ্ছ্বাসে বিধ্বস্ত এলাকা ঘুরে আসেন। ২৩ নভেম্বর পল্টনে এক ঐতিহাসিক জনসভায় তিনি বক্তব্য রাখেন। সে বক্তব্যের শেষে স্লোগান তোলেন, "স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান জিন্দাবাদ"। আবার ৩০ নভেম্বর 'জনগণের প্রতি মওলানা ভাসানীর ডাক' শীর্ষক এক প্রচারপত্রে তিনি আবেদন রাখেন, "পূর্ব পাকিস্তানের আজাদি রক্ষা ও মুক্তি সংগ্রামে ঝাঁপাইয়া পড়ুন।" বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামে সম্ভবত এটাই প্রথম পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি।

এ ছাড়া বাষট্টির শিক্ষা আন্দোলন, স্বায়ত্তশাসনের দাবির ভিত্তিতে ছেষট্টির ছয় দফা আন্দোলন, স্বায়ত্তশাসন ও শ্রমিক-কৃষকদের মুক্তির দাবি সহ ১১ দফার ভিত্তিতে ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান— এই ঘটনাগুলো পাকিস্তানের পুঁজিপতিদের ভিত কাঁপিয়ে দেয়। এর পরবর্তীতে ১৯৭০ সালের গণপরিষদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিপুল বিজয় শুধুমাত্র একটা দলের নির্বাচনী বিজয় ছিল না। এটি ছিল পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশের আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন। ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু এই সকল আন্দোলনে বামপন্থীদের একটা ঐতিহাসিক ভূমিকা ছিল।

১৯৭১ সালের সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ এই গণআন্দোলনগুলোর স্বাভাবিক পরিণতি। এতে প্রায় সকল রাজনৈতিক দল ও লক্ষ কোটি জনগণ সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছে। কিন্তু এই গৌরব আওয়ামী লীগ একা আত্মসাৎ করতে গিয়ে এই মহান মুক্তিযুদ্ধকে প্রশ্নবিদ্ধকরেছে। এই মুক্তিযুদ্ধে জাতির একটা অতি ক্ষুদ্র অংশ রাজাকার, আলবদর বাহিনী যেমন ন্যাক্কারজনক ভূমিকা পালন করেছে, তেমনি লক্ষ কোটি জনগণ অসীম সাহসিকতার সাথে লড়াই করে পাক বাহিনীকে প্রতিহত করেছে।

পরবর্তীকালে বাংলাদেশের ঘটনাবলি মহান লেনিনের সেই অবিস্মরণীয় উক্তি স্মরণ করিয়ে দেয়, "সাম্রাজ্যবাদের যুগে শ্রমিক শ্রেণির নেতৃত্বে স্বাধীনতা আন্দোলন পরিচালিত না হয়ে যদি বুর্জোয়াদের নেতৃত্বে পরিচালিত হয়, তাহলে সে স্বাধীনতা হবে আধসেঁকা রুটির মতো।" লক্ষ লক্ষ মেহনতি মানুষের আত্মত্যাগের বিনিময়ে বাংলাদেশের যে স্বাধীনতা অর্জিত হল, আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদ চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে যাওয়ার ফলে ও সাম্রাজ্যবাদী স্তরে উত্তীর্ণ হওয়ার ফলে এ দেশে শেখ মুজিবের নেতৃত্বে যে পুঁজিবাদী রাষ্ট্র গঠিত হল তা প্রথম দিন থেকেই শোষণ, জুলুম ও স্বেচ্ছাচারিতার দিকে পা বাড়াল। ১৯৭১ থেকে ১৯৭৫ এই চার বছরে শেখ মুজিবের নেতৃত্বে একটার পর একটা জনবিরোধী নীতি রাষ্ট্র কার্যকরী করতে শুরু করে। সাংবাদিক ও বিরোধীদের ধরপাকড় ও হত্যা করতে শুরু করে। বন্দি অবস্থায় হত্যা করা হয় পূর্ব বাংলা সর্বহারা পার্টির নেতা সিরাজ সিকদারকে। জাসদের ৩০ হাজার কর্মীকে হত্যা করা হয়। একটার পর একটা সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করা হয়। সর্বশেষ ১৯৭২ সালে রচিত সংবিধানকে কবরস্থ করে ১৯৭৪ সালের ডিসেম্বরে জরুরি অবস্থা জারি করা হয়, ১৯৭৫ সালের জানুয়ারিতে চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে একদলীয় শাসন কায়েম করা হয় এবং ফেব্রুয়ারিতে 'বাকশাল' গঠন করার মাধ্যমে সেই জাতীয় দল গঠন করা হয়। বাকশাল ছাড়া অন্য সকল দল নিষিদ্ধ করা হয় এবং ৫টি বাদে সকল সংবাদপত্র নিষিদ্ধ করা হয়। এ সময় যদি একটি যথার্থ মার্কসবাদী দল উপস্থিত থাকত তাহলে এর বিরুদ্ধে সত্যিকারের প্রতিরোধ গড়ে তোলা যেত।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট শেখ মুজিবুর রহমান সপরিবারে নিহত হওয়ার পর ১৯৯০ সাল পর্যন্ত একের পর এক ক্যু, পাল্টা ক্যু চলতে থাকে এবং সর্বশেষে নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে সামরিক শাসক এরশাদ ক্ষমতা থেকে বিতাড়িত হয়। সামরিক শাসনের অবসানের পরও দেশের স্থায়িত্ব আসেনি। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৯৬ সালে ক্ষমতায় আরোহণের সময় শেখ হাসিনা জামায়াতের সাথে কৌশলগত ঐক্য করেন, ২০০১ সালে বিএনপি জামায়েতের সাথে জোট করে ক্ষমতায় আসে। পরবর্তীতে ২০০৯ সাল থেকে ২০২৪ সালের গণঅভ্যুত্থান পর্যন্ত আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় ছিল। এই প্রতিটি সরকারই ক্রমাগত গণতান্ত্রিক অধিকার ক্ষুণ্ণ করেছে, একের পর এক জনবিরোধী নীতি কার্যকর করেছে এবং শেষ ১৫ বছর আওয়ামী লীগ এই শোষণ-জুলুম-অত্যাচার-বাকস্বাধীনতা হরণকে চূড়ান্ত জায়গায় নিয়ে গেছে। ২০১৪, ২০১৮ ও ২০২৪ সালে অনুষ্ঠিত জাতীয় নির্বাচনকে প্রহসনে পরিণত করে আওয়ামী লীগ তার বিরুদ্ধে গণঅভ্যুত্থানের পথ প্রশস্ত করেছে। ইতিহাসের এই বর্ণনায় আমরা নতুন কিছু আনিনি। জুলাই ঘোষণার মধ্যে যে উল্লেখযোগ্য ফাঁকটি থেকে গিয়েছিল তা ভরাট করেছি মাত্র।

বাহাত্তরের সংবিধান প্রসঙ্গে

বাহাত্তরের সংবিধান নিয়ে তাদের আলোচনাটাও অনেকটা একপাক্ষিক। এই ঘোষণাপত্রে তারা ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল নবগঠিত সরকারের যে ঘোষণা দেয়া হয়, বাংলাদেশের সংবিধানের যথার্থ ভিত্তি হিসেবে সেটাকেই ধরছেন।

অথচ ১০ এপ্রিলের এই ঘোষণাপত্রে শেখ মুজিবকে সকল প্রকার প্রশাসনিক ও আইন প্রণয়নের ক্ষমতার অধিকারী করা হয়েছে। তাঁকে প্রধানমন্ত্রী সহ সকল মন্ত্রীদের নিয়োগ, গণপরিষদ আহ্বান ও মুলতুবি করা, জনসাধারণের জন্য আইনানুগ ও নিয়মতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনীয় সকল ক্ষমতার অধিকারী হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র শেখ মুজিবকে যে ক্ষমতা দিয়েছে, বাহাত্তরের সংবিধান এর চেয়ে বেশি কিছু করেনি। বাহাত্তরের সংবিধান প্রণয়নের ক্ষেত্রে শেখ মুজিব গণপরিষদ নির্বাচনের দিকে না গিয়ে ১৯৭০ সালের গণপরিষদ ও প্রাদেশিক নির্বাচনে বিজয়ী প্রতিনিধিদের নিয়েই গণপরিষদ গঠন করলেন ও সংবিধান প্রণয়নের কাজ শুরু করলেন। ফলে একটা অগণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সংবিধান রচনা শুরু হল। জুলাই ঘোষণার ঘোষণাকারীরা হয়তো লক্ষ করেননি, তাঁরা স্বাধীনতার ঘোষণপত্রে উল্লেখিত সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচার এই তিনটি শব্দের উপর যে জোর দিয়েছেন, তাও বাহাত্তরের সংবিধানে উল্লেখ করা আছে। এগুলোকে অন্যতম মূল লক্ষ্য হিসেবে সংবিধানে উল্লেখ করা হয়েছে। কথাটা এইভাবে আছে যে, "...আমাদের রাষ্ট্রের অন্যতম মূল লক্ষ্য হইবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এমন এক শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রতিষ্ঠা যেখানে সকল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য, স্বাধীনতা ও সুবিচার নিশ্চিত হইবে।"

বলাই বাহুল্য যে, ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিলের স্বাধীনতা ঘোষণার মতোই বাহাত্তরের সংবিধানেও প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শেখ মুজিবের হাতে প্রভূত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করা হয়। ফলে আমাদের দলের সুবিবেচিত মতামত হল যে, ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিলের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র ও ১৯৭২ সালের সংবিধানের মধ্যে মৌলিক কোনও পার্থক্য নেই। আমরা আরও মনে করি, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, সমাজতন্ত্র, রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক সাম্য, মৌলিক মানবাধিকার, স্বাধীনতা ও সুবিচার— এই শব্দগুলো লক্ষ কোটি জনগণের আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন হওয়ার ফলে আওয়ামী লীগ বাহাত্তরের সংবিধানে এগুলি অন্তর্ভুক্ত করতে বাধ্য হয়েছিল। মানব সভ্যতার এই প্রগতিশীল ধারণাগুলো প্রকৃত কার্যকর করার কোনও ইচ্ছাই তাদের ছিল না, যা দিনের আলোর মতো স্পষ্ট হয়ে যায় যখন আমরা দেখি ১৯৭২ সালের সংবিধান প্রণয়নের তিন বছরের মধ্যেই শেখ মুজিব চারটি সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানকে সম্পূর্ণ পাশ কাটিয়ে জরুরি অবস্থা জারি করে একদলীয় শাসন বাকশাল চালু করেন।

এই সংবিধান প্রণয়নের আগে ১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সভায় জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রকে মুজিববাদ হিসেবে ঘোষণা করা হয়। পরবর্তীতে সংবিধানে

ছয়ের পাতায় দেখুন

এ মিছিল তো আমারই

কত মিছিল তো দেখেছে কল্লোলিনী কলকাতা! কতবার শত সহস্র পদভারে কম্পিত হয়েছে কালো পিচ ঢালা রাজপথ। কত নিদাঘের ঘর্মাক্ত দুপুরে, অজস্র বর্ষণে সিক্ত সন্ধ্যায় কিংবা পাতা ঝরা শীতের সোনালী রৌদ্রে ঝলসে উঠেছে উদ্ধত মুষ্টিবদ্ধ স্লোগান। কিন্তু ২১ জানুয়ারির এমন মহামিছিলই বা কলকাতা দেখেছে কতদিন? এ মিছিল ছিল এক দৃঢ় প্রতিজ্ঞার, এক নির্দিষ্ট অভিমুখে নিবিষ্ট। কারণ

এই মিছিলের ছিল এক পূর্বপ্রস্তুতি। দীর্ঘ পাঁচমাস ধরে কলকাতা মহানগর সহ সারা বাংলা প্রত্যক্ষ করেছে অভিনব প্রতিবাদ। আর জি কর হাসপাতালে কর্তব্যরত তরুণী চিকিৎসকের ওপর নৃশংস নির্যাতন ও হত্যার বিচার চেয়ে গড়ে উঠেছে এক অভূতপূর্ব গণজাগরণ। ক্ষুদ্র গণ্ডিবদ্ধ জীবনের স্বার্থপরতা, হীনতা, আত্মকেন্দ্রিকতার বেড়া ভেঙে অপার পবিত্র আত্মীয়তায় একে অপরের হাতে হাত রেখে গর্জে উঠেছে মানুষ। শহর গ্রাম জুড়ে কিশোরীর হাতের আল্পনার মতো অজস্র মিছিলে উচ্চকিত হয়েছে বিচারের দাবি। দলীয় স্লোগানের সাথে ভুক্তভোগী মানুষের এক অবজ্ঞার দূরত্ব থাকে। কিন্তু সেই স্লোগানই কখন আটপৌরে মেয়ের মতো পাড়ায় এলাকায় ঘরের অন্তঃপুরে এমন আপন হয়ে উঠেছে— উই ওয়ান্ট জাস্টিস।

এই অসংখ্য অসংগঠিত স্বতঃস্ফূর্ত গণপ্রতিবাদকেই মালার মতো গেঁথেছে ২১-এর মহামিছিল। কারণ এই অভিনব গণজাগরণ কেবল একটি হত্যা বা নির্যাতনের প্রতিবাদ নয়, এই সূচিমুখ দিয়ে মুক্ত হয়েছে বহুদিনের অব্যক্ত নিষ্পেষণ, বেদনা, প্রতিবাদের লাভাস্রোত। বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলনের অন্যতম মহান নেতা কমরেড মাও সে তুং-এর এক অমূল্য শিক্ষা— 'ফ্রম দ্য মাসেস, টু দ্য মাসেস'। এই সমাজেই আছে মানুষের অনমনীয় তেজ, অকুতোভয় প্রতিরোধের শক্তি। সেই অশৃঙ্খলিত, বিচ্ছিন্ন প্রতিবাদগুলিকে একটি বিপ্লবী দল আকরের মতো ধারণ করে। বিপ্লবী প্রজ্ঞায় শাণিত করে। তারপর তাকে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে চালিত করে গণআন্দোলনে। তাই এই পাঁচ মাস ধরে বাংলার গ্রামে শহরে পাড়ায় মহল্লায় যে অজস্র স্বতঃস্ফূর্ত গণপ্রতিবাদ ফুটে উঠেছে ফুলের মতো, বিশ্বসাম্যবাদী আন্দোলনের আর এক মহান নেতা কমরেড লেনিনের স্মরণ দিবস ২১ জানুয়ারি কলকাতার বুকে হাজার হাজার মানুষের মহামিছিল সেই অসংখ্য পুষ্পে সজ্জিত। মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ অমোঘ লক্ষ্যে শাণিত। তাই ২১ জানুয়ারি কলকাতার বুকে মহামিছিল, ছাত্র যুব নারী শ্রমিক কৃষক— সমাজের নানা স্তরের মানুষের মহামিলনের তরঙ্গ দুকূল প্লাবিত করে এগিয়েছে, রাস্তার দুধারে দাঁড়ানো মানুষের সহর্ষ অভিবাদনকে সঙ্গী করে।

শিশু কোলে মা হাঁটছে মিছিলে। ঘুমিয়ে গেছে ছেলে। তবু হাঁটছে মা। মেডিকেল কলেজের সামনে দাঁড়ানো এক মা গভীর আবেগে বলছে, এ মিছিল তো আমারই। আমারও তো এমনি হাঁটা উচিত। কলেজ স্ট্রিটের সামনে চলছে মিছিলের জনপ্লাবন। স্কুল পড়ুয়া ছাত্ররা দু'পাশে দাঁড়িয়ে। মিছিলের স্লোগান অনুরণিত হচ্ছে কচিকণ্ঠে—উই ওয়ান্ট জাস্টিস। মিছিল এগিয়ে চলেছে। হিন্দ সিনেমার মোড়ে আটকে পড়া পথচলতি মানুষ। সাধারণভাবে থমকে যাওয়া মানুষ বিরক্ত হয়। খোঁজে মিছিলের শেষ। কিন্তু মিছিল বাড়ছে, মিছিল চলছে। শেষ নেই তার। এই দীর্ঘ মিছিলের পাশে দাঁড়ানো মানুষের বিরক্তি নেই, এক অপূর্ব প্রশান্তি চোখে মুখে। শেষ নয়, মিছিলের শেষ না হওয়াতেই যেন আনন্দ তাদের। কারণ এই মিছিল আর জি করের নির্যাতিতার বিচারের লড়াইকে তীব্র করবে তাই নয়, আরও অসংখ্য অবিচারের বিরুদ্ধে শোষিত মানুষের সংগ্রামকে উদ্বুদ্ধ করবে। এই প্রাণবন্ত জনস্রোতের অংশীদার কিংবা পাশে দাঁড়ানো অগণিত জনতার দীপ্ত উদ্ভাসে এই মহামিছিল অনন্য।

কৌশিক চ্যাটার্জী, বহরমপুর

বুঝলাম, মানুষ কত ভালোবাসে এই পার্টিকে

যেদিন শুনলাম এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) পার্টি মূল্যবৃদ্ধি রোধ, অভয়ার ন্যায়বিচার, শিক্ষা-স্বাস্থ্য-বিদ্যুৎ সহ বিভিন্ন দাবিতে মহান লেনিনের প্রয়াণ দিবসে মহামিছিলের ডাক দিয়েছে। মনে হয়েছিল সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত। এরপরই শুরু জোরকদমে প্রচার। বাড়ি বাড়ি প্রচারে অসাধারণ সাড়া পাওয়া যায়। মানুষ দু'হাত ভরে সাহায্য করেছেন। খুবই সাধারণ শ্রমিক যারা আগে মাথা নিচু করেই মালিকের নাম করে বলতেন কিছু দিতে পারব না, তাঁরাও আমাদের প্রত্যাশা ছাপিয়ে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। সাধারণ মানুষই বলে দিচ্ছেন কোথায় কোথায় আরও বাড়ি আছে যাতে সেখানেও আমরা আমাদের বক্তব্যটা নিয়ে যেতে পারি। সাইকেলে মাইক বেঁধে প্রচার চলছিল। প্রচারের সময় দোকানের এক কর্মচারী বললেন 'আপনারা সাইকেলে ব্যানার না বেঁধে একটা বড় গাড়ি করুন যাতে সবার চোখে পড়ে'। অটো প্রচারের মাঝে চা খেতে গেছি। চা বিক্রেতা বললেন, 'দিদি, আপনারা মিছিলটা রবিবার করতে পারতেন, তা হলে আমাদের যেতে সুবিধা হত'।

এরকম ভাবেই ২১ জানুয়ারি এসে উপস্থিত হল। মিছিলের আগে সভা চলছে। বক্তব্যের সময় মনে হয়েছিল যতদূর চোখ যায় ততদূর শুধুই মানুষের মাথা। পরে শুনলাম মিছিল প্রায় এক ঘণ্টা ধরে গেছে। রাস্তায় হাঁটার সময় দু'পাশে দাঁড়িয়ে থাকা অজস্র সাধারণ মানুষ মিছিল দেখছেন। চোখে মুখে তাঁদের বিরক্তির কোনও ছাপ নেই। এই পার্টিকেই ভরসা করা যায়।

২১ জানুয়ারির জনপ্লাবনের খবর পরের দিনের সংবাদপত্রে ছিল নামমাত্র। মহামিছিলের খবর গণদাবীর মাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়ার আহ্বান জানায় পার্টি নেতৃত্ব। মানুষ তা সানন্দে গ্রহণ করছেন ও পড়ছেন। কাগজ বিক্রি করতে গিয়ে দেখলাম, এক বাবা কাগজ নিয়ে মেয়ের হাতে দিয়ে বলছেন, 'এই নে, এটা তোরই পড়া দরকার'। আবার কেউ জিজ্ঞেস করছেন 'তুমি এই পার্টিটা করো?' হ্যাঁ বলায়, তিনি বলছেন, 'বাহ্! এই পার্টিটাই করা উচিত'। ২১ জানুয়ারি শুধু একুশেই শুরু আর তাতেই শেষ নয়। এটা একটা জার্নি। এই পার্টির প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা, ভালবাসা ও ভরসার জায়গা উপলব্ধি করার একটা বড় সুযোগ হল ২১ জানুয়ারি।

অনন্যা মুখার্জী, চিত্তরঞ্জন

এ মিছিল আগামীর স্বপ্নের

তিনের পাতার পর

পথ। কৃষকের ফসলের ন্যায্য মূল্য আদায় করতে ঝরাতে হবে অনেক ঘাম। খেটে খাওয়া মজুর, শ্রমিকের ঝরা সে ঘামে-রক্তে বারে বারে পিছল হয়ে উঠবে এ পথ। এ তারা বেশ জানে। তবুও আজ সুদূর পাহাড় থেকে সমুদ্র এসে মিশেছে মিছিলে। লক্ষ কণ্ঠে জোরালো হয়েছে তাদের দাবি। তাদের অধিকার বুঝে নেওয়ার দাবি। এক কাঁধে ব্যাগ, আর এক কাঁধে সন্তান নিয়ে মায়েরা হাঁটছে। সবচেয়ে ছোটরাও শিখে গেছে কেমন করে হাতে লাল পতাকা নিয়ে দৃপ্ত পায়ে এগিয়েযেতে হয়। কীভাবে গলা তুলে স্লোগান দিতে হয়। দাদু নাতনিকে নিজের কাঁধে তুলে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে পথ চিনিয়ে দিতে বলছেন— দেখ ভালো করে, মনে রাখ সবকিছু। কেমন করে ইতিহাস তৈরি হচ্ছে। প্রস্তুত হ আগামী দিনের জন্য। শক্ত কর নিজের মনকে। আগামী লড়াই তো তোদের! এ লড়াই বাঁচার লড়াই। ছাত্র, যুব, মহিলাদের কণ্ঠে স্লোগান যখন কাঁপিয়ে তুলেছে দশ দিশ, রাস্তার দু'পাশে মানুষ সে উত্তাপ অন্তরে গ্রহণ করেছে। উষ্ণ অভিনন্দন জানিয়েছেন কেউ কেউ। কেউ কেউ কেবল নীরব দর্শক হয়ে না থেকে, নিজ উদ্যোগে স্বেচ্ছাসেবকের ভূমিকা পালন করেছেন। এইভাবে অগণিত সাধারণ নাগরিক একাত্ম হয়েছেন এই যাত্রাপথে। আশার অভিব্যক্তি সঞ্চারিত হয়েছে তাঁদের মনে। সত্যিকার নাগরিক সমাজের মিছিলে পরিণত হয়েছে এ মিছিল।

এস ইউ সি আই (সি) দলের সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ হেঁটেছেন এই মিছিলের সামনে। সামনের সারিতে দলের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। এ যুগের মহান দার্শনিক, পথপ্রদর্শক কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তার আলোকে আলোকিত নিশান যাঁরা সংগ্রামী চেতনায়, জ্ঞানের প্রজ্ঞায় বহন করে চলেছেন। সমাজের এই অন্ধকারের মাঝে আলোর নিশান হাতে তাঁরা অগ্রপথিক। পেছনে অগণিত কর্মী, সমর্থক, সাধারণ মানুষ। এমনও আছেন কেউ, এই প্রথম হয়তো এরকম মিছিলে তাঁর পা মেলানো। এ মিছিলে আসার আগে, কেউ হয়তো বলেছিল, কিচ্ছু হবে না। ওসব আন্দোলন-টন সব বৃথা। কেউ কিচ্ছু করতে পারবে না। কেউ বলেছিল, আমরা হতাশ। এত মানুষের রাত দখল, সব বৃথা। কেউ কিছু করতে পারবে না। ভয় ভীতি আর টাকার কাছে সব বশ। মনের এই বাধাগুলো পেরিয়ে, কী হবে আর কী হবে না, ভাবনার এই দোলাচলকে উপেক্ষা করে তাঁরা এসেছেন এ মিছিলে। সত্য প্রতিষ্ঠা করা কি সহজ কথা? এ কথা তাঁরা অনেক মূল্যের বিনিময়ে উপলব্ধি করছেন। ধীরে ধীরে চিনছেন এই সমাজকে, সামাজিক

কাঠামোকে। পুলিশ, প্রশাসন, আইন, বিচার ব্যবস্থা, পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের এই স্তম্ভ গুলোকে তাঁরা চিনতে পারছেন। হাহাকার আর আর্ত মানুষের অসহায় করুণ চাহনির সামনে এ মিছিল তাই সমস্ত অন্যায়ের চোখে চোখ রেখে স্পর্ধার প্রতিবাদ। আগামী দিনের আশার স্বপ্ন বহনকারী।

অনিন্দিতা জানা
মেদিনীপুর

মানুষ খুঁজছে বিকল্প রাজনীতি

আমার রাজনৈতিক-জীবনের ২০ বছরে কোনও দলের একক শক্তিতে এত মানুষের এত বড় মিছিল আমি দেখিনি।

কেউ মানতে চাক বা না চাক, পশ্চিমবঙ্গে এসইউসিআই(সি) এখন একটা শক্তি। শ্রীমানি মার্কেটে বাজার করতে আসা এক ব্যক্তি মিছিল দেখে বিস্ময়ে চিৎকার করে বললেন, 'এস ইউ সি-র এত লোক!'

চেনা, অল্প চেনা কর্মীদের ভিড়ে হাজার হাজার অচেনা মুখ। বিশেষত যারা দূরের জেলা থেকে আগের দিন রওনা দিয়েছেন, কিছুটা ক্লান্ত। মুড়ি খাচ্ছেন, কেউ বাড়ি থেকে তৈরি করে আনা রুটি। সেই মানুষই উঠে দাঁড়ালে স্লোগানে স্লোগানে মুখরিত হয়ে উঠল হেদুয়া চত্বর। বুকের জমানো ব্যথা, মেহনতি মানুষের অধিকার বোধ আর ঐক্যবদ্ধ জনতার স্পর্ধা নিয়ে শুরু হল মহামিছিল।

শুধু মিছিলে হাঁটা নয়, কিছু একটা ভূমিকা পালন করতে চাইছিলাম। শ্রীমানি মার্কেট মোড়ে মিছিলের ভলান্টিয়ার হয়ে গেলাম। একদিকে দেখলাম অনিমেষদা তাঁর বন্ধুকে নিয়ে একই ভূমিকা পালন করছেন। কিন্তু উল্টোদিকে কেউ নেই— একা এক সিভিক ভলান্টিয়ার সেই ভূমিকা নিয়েছেন। দাঁড়িয়ে পড়লাম তাঁর পাশে। দীর্ঘ মিছিল। সকলেই ব্যস্ত। এতক্ষণ রাস্তা আটকে মিছিল। বিস্মিত হলাম— সকলেই দাঁড়িয়ে মিছিল দেখছে, মোবাইলে ভিডিও কল করে বন্ধু, বাড়ির লোকেদের বলছে, 'দেখ এস ইউ সি আই-এর মিছিল দেখ, মিছিলের শেষ দেখতে পাচ্ছি না।'

এক স্কুলছাত্রীর মা বাড়ি ফিরতে দেরি হচ্ছে বলে কিছুটা বিরক্ত। দেখলাম, সেই সিভিক ভলান্টিয়ার তাঁকে বোঝাচ্ছেন, কেন এই মিছিল, কেন মিছিলটা জরুরি। আর এক অবাঙালি ভাই, তিনিও মানুষকে বোঝাচ্ছেন, বাইক-সাইকেল নিয়ন্ত্রণ করছেন! যেন আমার কোনও কাজ নেই, জনগণই দায়িত্ব নিয়ে নিয়েছে যাতে মিছিল

সুশৃঙ্খল ভাবে এগিয়ে যেতে পারে। এ মিছিল তাদেরও। হ্যাঁ, এ জনতার মহামিছিল। শেষে সেই সিভিক ভলান্টিয়ার দাদাকে ধন্যবাদ দিয়ে এলাম।

যে সমাজ, যে রাষ্ট্র, যে শাসক, যে রাজনীতি এতসব অপরাধীর জন্ম দেয়, দুর্নীতি, খুনি, ধর্ষকের জন্ম দেয়, মানবিক মূল্যবোধ, বেঁচে থাকার অধিকার কেড়ে নেয়, সেই শাসক ও রাজনীতির বিরুদ্ধে দাঁড়াচ্ছে হাজার হাজার মানুষ। মানুষ আন্দোলনে আসছেন, ভাবছেন, স্বপ্ন দেখছেন বিকল্প রাজনীতির। আজকের মিছিল সেটাই প্রমাণ করল।

অর্ক মালিক, বেলমুড়ি, হুগলি

ডালিম দিদি

২১-এর মিছিলের আগের শেষ রবিবার। প্রচার চলছে বেহালার সখের বাজারে। এক বয়স্ক সবজিওয়ালা দিদি আমার হাত দুটো ধরে বললেন আমাকে মিছিলে নিয়ে যাবে? আগ্রহী হয়ে জিজ্ঞেস করলাম তুমি মিছিলে হাঁটতে যাবে কেন? জানো মিছিলটা কেন হচ্ছে? সপ্রতিভ উত্তর, তোমরা তো ওই ডাক্তার দিদির বিচার চাইতে মিছিল করছ। সেই জন্যই তো আমি তোমাদের সাথে যেতে চাইছি। বললাম পরের দিন সকালে তোমাকে ডাকবো।

সামান্য কিছু শাক, থানকুনি পাতা এই নিয়ে বাজারের ভিতরে সে বসেছিল। আমি যেতেই সব গুছিয়ে তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল। বাসে কথা বলতে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম তোমার আজকের রোজগার? বলল প্রায় দিনই তো হয় না, আজকেও নয় নাই হল! বেশ কষ্ট করেই মিছিলটা হাঁটলেন। দিদির নাম ডালিম দিদি।

স্মরণিকা করগুপ্ত, বড়িশা, কলকাতা

আমরা কেউ একা নই

হতাশা বাড়ছিল ক্রমশ একটার পর একটা দোষীদের জামিনে। অতঃপর কোর্টের প্রহসন একমাত্র সঞ্জয় রায়ের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড।

তা হলে এত মানুষের আন্দোলন, সবই কি বৃথা? চোখ বন্ধ করলেই মনে পড়ে ১৪ আগস্টের রাতের কথা, স্বাস্থ্য ভবনের ঝড় বৃষ্টির মধ্যে ডাক্তারদের আন্দোলনে মানুষের ভিড়, ধর্মতলায় ডাক্তারদের অনশন।

তাহলে সবই কি বিফলে যাবে? হতাশা ক্রমশ বাড়ছিল। চাকরি নেই, শিক্ষা নেই, বাঁচার অধিকারটুকু পর্যন্ত নেই। ইতিমধ্যেই বন্ধ হয়ে গেছে আট হাজারের বেশি সরকারি স্কুল। সরকারি হাসপাতালে বন্ধ হয়ে গেছে বহু প্রাণদায়ী ওষুধ, সম্প্রতি বিষ স্যালাইনে প্রাণ হারিয়েছেন প্রসূতি মা।

চালু হতে চলেছে আরও অনেক মানুষ-মারা নীতি। হতাশা যেন ক্রমশ গিলে ফেলছিল, কিন্তু কী করব?

হাত গুটিয়ে ঘরে বসে থাকলেও তো সমাধান হবে না। যারা বোঝে না, যারা ভাবে না, যারা চোখে কালো চশমা পরে ঘুরে বেড়ায় তাদের দলে তো আমি নই, তাই ২১ তারিখ বেরিয়ে পড়লাম আমার ফ্রি কোচিংয়ের কয়েক জন ছাত্রীকে নিয়ে। মিছিলের স্পটে যখন পৌঁছেছি তখন বেলা প্রায় ১টা। যেন এক জনসমুদ্রে এসে পড়লাম।

না, আমি একা নই। সমাজ নিয়ে এত মানুষ ভাবে! মানুষগুলোর মুখের দিকে তাকাচ্ছিলাম বারবার। এই চাকরি না পাওয়া, বিচার না পাওয়া, ষড়যন্ত্রের শিকার হওয়া মানুষগুলো অবুঝ নয়, তা না হলে মিছিলে কেনই বা আসবে? এদের তো এমএলএ নেই, এমপি নেই, টাকার থলির জোর নেই। তারপরেও মানুষ আবেদনে সাড়া দিয়েছে।

মিছিলে হাঁটছি। আমার এক ছাত্রী হাতটা শক্ত করে ধরে আছে, মিছিলের ভিড়ে যদি হারিয়ে যায়। আমিও তার হাতটা শক্ত করে ধরে আছি আর স্লোগানে গলা মেলাচ্ছি। হঠাৎ করে সে বলল আর কত দূর ম্যাম? পা ব্যথা করছে। আমি উত্তর দেওয়ার আগেই আমার আর এক ছাত্রী ক্লাস এইট-এর মেঘনা তাকে সাহস দিয়ে বলল, আর বেশিদূর নয় এই তো সামনেই, চল আর একটু চল। মনটা অপরিসীম আনন্দে ভরে গেল। মেঘনাকে পড়াশোনা নিয়ে কত বকাবকি করি!

সেই মেঘনা বুঝেছে এই মিছিলে হাঁটা তার কর্তব্য। তাই ক্লান্তিকে উপেক্ষা করে সে হেঁটে চলেছে। মিছিল চলছে, মেঘনা, পূজা স্লোগানে গলা মেলাচ্ছে। 'ন্যায় বিচার দেবে না, নিস্তার পাবে না'। দেখলাম কয়েকজন দৃষ্টিহীন মানুষও হাঁটছেন আমাদের সাথে। মনে মনে বললাম, চোখের দৃষ্টি না থাকলেও অন্তর্দৃষ্টি ওঁদের ঠিকই আছে। সেই দৃষ্টি দিয়েই বুঝে নিয়েছেন, কোন মিছিলে হাঁটা উচিত।

এই মিছিলটা ছিল সমস্ত সংগ্রামী মেহনতি মানুষের, যারা উঠে দাঁড়াতে চায়। এসইউসিআই(সি) তার সংগঠক। মিছিল ক্রমশ এগিয়ে যাচ্ছে ধর্মতলার দিকে। রাস্তার দুপাশে মানুষের ঢল। ছাত্র যুবক শ্রমিক মজুর নারী-পুরুষ চিৎকার করে স্লোগান তুলছে।

স্লোগান তো নয়, যেন হৃদয় নিংড়ানো লড়াইয়ের আহ্বান। নাহ্, আমি একা নই। এই গোটা মিছিলটা আমার সাথে আছে। শাসক তুমি শুনতে পাচ্ছো— আমরা কেউ একা নই। ভয় দেখিয়ে ক্ষমতার জোরে প্রহসন করে হতাশায় আমাদের ডুবিয়ে রাখা যাবে না। আমাদের কণ্ঠরোধ করা যাবে না।

শবনম সাজু, সল্টলেক

চা শ্রমিকরাও মিছিলে

মহামিছিল যখন এগিয়ে যাচ্ছিল কলকাতার ব্যস্ত মুহূর্তে রাস্তা ছাপিয়ে, তা কিন্তু সাধারণ মানুষের বিরক্তির কারণ হয়নি। আলিপুরদুয়ার জেলার মূল ব্যানারে রাজ্যের দাবির সঙ্গে বন্ধ চা বাগান খোলা ও চা শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরির দাবি দেখে রাস্তার পাশে দাঁড়ানো মানুষ বলে উঠলেন, দেখেছো, এদের মিছিলে চা শ্রমিকরাও এসেছেন কত দূর থেকে।

সুদীপ দাস
আলিপুরদুয়ার

বাংলাদেশের সংবিধান সংস্কার

তিনের পাতার পর

এটাকেই মূলনীতি করা হয়। এটাকে কেন্দ্র করে এই প্রশ্ন এখন এসেছে যে, এই সংবিধানের ভাবাদর্শগত ভিত্তি হলো মুজিববাদ। এ ক্ষেত্রে জেনে রাখা উচিত যে, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা একটা আধুনিক, গণতান্ত্রিক সংবিধানের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। ১৭৮৯ সালে ফরাসি বিপ্লবের মধ্য দিয়ে বুর্জোয়ারা সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা, ধর্মনিরপেক্ষতা, নারীস্বাধীনতা, এক মানুষ-এক ভোট এ সকল প্রগতিশীল ধারণাগুলো নিয়ে এসেছিল। এরপর থেকে সকল বুর্জোয়া রাষ্ট্রই তাদের সংবিধানকে এই ধারণাগুলোর উপর দাঁড় করায়। যদিও আজকের এই সাম্রাজ্যবাদের যুগে আন্তর্জাতিকভাবে বুর্জোয়ারা প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে যাওয়ার কারণে সকল দেশেই এই ধারণাগুলো সংবিধানে লেখা আছে, বাস্তবে রাষ্ট্রের কোথাও এর কার্যকারিতা নেই। ১৯১৭ সালে রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ফলে সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠিত হয়। পুব দিগন্তে এই সভ্যতার উদয় দেখে একে সালাম জানিয়েছিলেন আইনস্টাইন, রমাঁ রলাঁ, বার্ট্রান্ড রাসেল, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলামসহ বিভিন্ন মনীষী। এরপর থেকে স্বাভাবিকভাবেই রুশ দেশের এই শোষণবিহীন সমাজব্যবস্থা সমাজতন্ত্র জনগণের একটা গুরুত্বপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা ও চাহিদা হিসাবে উপনিবেশগুলির স্বাধীনতা আন্দোলনে বারবার ধ্বনিত হয়েছে। বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামেও বহু বুদ্ধিজীবীর মুখ থেকে সমাজতন্ত্রের আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত হয়েছে। সংবিধান প্রণয়নের সময়ও এই দাবি উঠেছে। ১৯৭২ সালের ২ এপ্রিল পল্টনে ভাসানী বলেন, “একটি ন্যাশনাল কনভেনশন ডেকে সকলের মতামত নিয়ে শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করা উচিত ছিল। কিন্তু সরকার তা করেনি।” . . .“পরিষদের যে একদলীয় শাসনতন্ত্র প্রণীত হচ্ছে তাতে কৃষক শ্রমিক সর্বহারা মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি এবং খাঁটি সমাজতন্ত্রের নিশ্চয়তা থাকতে হবে।” ১৯৭২ সালের ১৪ এপ্রিল সন্তোষে ন্যাপের কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় এক প্রস্তাব গৃহীত হয় “সংবিধান হবে ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক। সকল ধর্ম মতের অনুসারী বাঙালি অবাঙালি নির্বিশেষে সকল সম্প্রদায়ের মানুষ যাতে আইনের দৃষ্টিতে সমান অধিকার পায়, সেজন্য শাসনতন্ত্রে নিশ্চয়তা থাকতে হবে।” ফলে আওয়ামী লীগ মুজিববাদ বলে যা দাবি করেছে, তা অন্তঃসারশূন্য।

এর পরের ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, ১৯৭২ সালের প্রণীত সংবিধানের উপর মোট ১৭টি সংশোধনী বিভিন্ন ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল এনেছেন। তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য সংশোধনী ছাড়া এর প্রত্যেকটি সংশোধনী জনগণের অধিকার কোনও না কোনওভাবে খর্ব করেছে। আমাদের দলের অভিমত হল, বাহাত্তরের সংবিধানের প্রগতিশীল ইতিবাচক দিকগুলোকে অক্ষত রেখে মূলত কাঠামোগত দিকটা সংস্কার করা উচিত। একইসাথে অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা, শিক্ষা ও কাজ এই ছয়টি মৌলিক অধিকারকে ‘মৌলিক অধিকার’ অধ্যায়ে সংযুক্ত করা উচিত এবং মূলনীতি ও মৌলিক অধিকার অধ্যায়ে রচিত অধিকারগুলোকে আইন দ্বারা বলবৎযোগ্য করা উচিত।

একটা কথা আমরা বলতে চাই, একটা গণতান্ত্রিক সংবিধান অবশ্যই জনগণের আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু এই ধনী ও দরিদ্র, বৃহৎ ব্যবসায়ী ও মেহনতি মানুষ, শোষক ও শোষিতে শ্রেণিবিভক্ত সমাজে সংবিধান সংস্কার করা সহজ, কিন্তু কার্যকর করা সহজ নয়।

দেশের সার্বভৌমত্ব প্রসঙ্গে

জুলাই ঘোষণাপত্রে এ বিষয়টি পরিষ্কারভাবে নিয়ে আসা জরুরি ছিল। বাংলাদেশের জন্মলগ্ন থেকেই দুনিয়ার বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী শক্তি, যেমন ভারত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় দেশগুলো ও পরবর্তীকালে চিন, রাশিয়া, জাপান তাদের বাজার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে এদেশের রাজনৈতিক সার্বভৌমত্বের উপর বারবার হস্তক্ষেপ করেছে। বর্তমান সময় এই হস্তক্ষেপ অনেকগুণ বেড়েছে। আমরা দ্বিধাহীনভাবে বলতে চাই যে, সবরকম সাম্রাজ্যবাদী হস্তক্ষেপ ও আগ্রাসনের বিরুদ্ধে জোরালো প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ গড়ে তোলা উচিত। দেশকে কোনওভাবেই জিম্মি রাখা যাবে না। দেশের সার্বভৌমত্ব অক্ষুণ্ণ রাখা সরকারের অবশ্যকর্তব্য।

দাবিসমূহ

১. অতি সত্বর গণঅভ্যুত্থানে নিহতদের প্রকৃত তালিকা প্রকাশ করতে হবে। তাদের পরিবারকে পুনর্বাসন করতে হবে। জুলাই গণহত্যার দ্রুত বিচার দিতে হবে।
২. আহতদের প্রয়োজনীয় চিকিৎসার বন্দোবস্ত করতে হবে। যে সকল আহতদের বিদেশে পাঠানোর জন্য রেফার করা হয়েছে, এদের ব্যাপারে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের দ্রুত উদ্যোগ নিতে হবে।
৩. নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। সিন্ডিকেট ও বৃহৎ কর্পোরেট গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে।
৪. সর্বজনীন রেশন ব্যবস্থা চালু করতে হবে।
৫. ন্যূনতম জাতীয় মজুরি ২০ হাজার টাকা ও গার্মেন্টস শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ২৫ হাজার টাকা ঘোষণা করতে হবে।
৬. কৃষকদের ফসলের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করতে হবে। বর্তমান ইরি মৌসুম থেকেই ফসলের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করতে হবে। সার, বীজসহ কৃষি উপকরণের দাম কমাতে হবে।
৭. সংস্কার ও নির্বাচনের রোডম্যাপ ঘোষণা করতে হবে।

ঘোষণাপত্র দু’টির মধ্যে পার্থক্য

প্রথম ঘোষণাপত্রে ৩০ নম্বর ঘোষণার ৩ নম্বর পয়েন্টে যে সকল রাজনৈতিক দলের নেতাদের অংশগ্রহণে সরকার গঠন, ‘ডিকলোনাইজড ট্রুথ অ্যান্ড হিলিং কমিশন’-এর প্রস্তাবনা, সেনাশাসন-রাষ্ট্রীয় পুঁজি-বৃহৎ ব্যবসায়ী-আমলাতন্ত্র এদের বিরুদ্ধে প্রস্তাবনা— এই প্রস্তাবনাগুলি অজ্ঞাত কারণে দ্বিতীয় ঘোষণায় নেই।

নতুন জনতন্ত্র (রিপাবলিক) প্রসঙ্গে

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সূচনা হয়। ২০২৪ সালের ছাত্র-জনতার বীরত্বপূর্ণ, বিপুল আত্মত্যাগের গণঅভ্যুত্থান বাংলাদেশের ইতিহাসে ইতোমধ্যেই জায়গা করে নিয়েছে। কিন্তু এই গণঅভ্যুত্থান পুরনো ব্যবস্থার পরিবর্তন করে নতুন কোনও ব্যবস্থা প্রবর্তন করেনি। কোনও নতুন রাষ্ট্রেরও জন্ম দেয়নি। একটি চূড়ান্ত অত্যাচারী, স্বেচ্ছাচারী সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করে সেনাসমর্থনে, বর্তমান সংবিধানের অধীনে শপথ নিয়ে একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন করেছে। ফলে দ্বিতীয় রিপাবলিকের ধারণাটি সঠিক নয়।

গণঅভ্যুত্থান প্রসঙ্গে

আওয়ামী লীগের গত ১৬ বছরের ফ্যাসিবাদী শাসনের বিরুদ্ধে অভূতপূর্ব জাগরণ এই গণঅভ্যুত্থান। প্রায় দেড় হাজারেরও অধিক প্রাণ দিয়েছেন এই আন্দোলনে। আহত হয়েছেন ২৫ হাজারেরও অধিক। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতৃত্বে পরিচালিত এই অভ্যুত্থানে আমরাও সর্বশক্তি নিয়ে অংশগ্রহণ করেছিলাম। এদেশে কোনও গণঅভ্যুত্থানকেই এত রক্তের স্রোত পাড়ি দিতে হয়নি। এত মানুষকে চোখের দৃষ্টি হারাতে হয়নি, পঙ্গু হতে হয়নি। এই বিরাট আত্মত্যাগ এই সময়ে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

এই গণঅভ্যুত্থান থেকে ফ্যাসিবাদ ধ্বংসের স্লোগান উঠেছে। কিন্তু আওয়ামী লীগের পতন মানেই ফ্যাসিবাদের পতন নয়। ফ্যাসিবাদ কোনও দল আনে না, ফ্যাসিবাদ আনে একটি ব্যবস্থা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তীকালে উন্নত কিংবা অনুন্নত সকল দেশেই ফ্যাসিবাদী প্রবণতা দেখা যায়। ফ্যাসিবাদ কায়েম একদলীয় শাসনের মাধ্যমে হতে পারে, দলীয় শাসনের মাধ্যমে হতে পারে, সামরিক শাসনের মাধ্যমে হতে পারে। দুনিয়ার দেশে দেশে ফ্যাসিবাদ গণতন্ত্রের মুখোশ পরেই এসেছে। আজকের যুগে কোনও পুঁজিবাদী দেশই জনজীবনের কোনও সমস্যার সমাধান করতে পারে না। ফলে সে জনগণের বিক্ষোভ দমনে রাষ্ট্রযন্ত্রকে ব্যবহার করে। এই ফ্যাসিবাদী প্রবণতা এ যুগে প্রত্যেকটি পুঁজিবাদী দেশে বিদ্যমান। অর্থাৎ পুঁজিবাদী রাষ্ট্রমাত্রেই আজ কমবেশি ফ্যাসিবাদী।

বর্তমান সময়ে ধর্মীয় মূল্যবোধ বা মানবতাবাদী মূল্যবোধ কোনওটাই পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের বেপরোয়া লুণ্ঠন, শোষণ ও অত্যাচার রুখতে পারবে না। পুঁজিবাদী সমাজের মূল্যবোধের চূড়ান্ত অবক্ষয়, অসহনীয় বেকারত্ব, একটার পর একটা দেশে ভয়াবহ যুদ্ধে লক্ষ লক্ষ নর-নারী ও শিশুর হত্যাকাণ্ড, অনাহারে ও বিনা চিকিৎসায় লক্ষ লক্ষ মানুষের মৃত্যু এই অধঃপতিত সমাজের একমাত্র বিকল্প সমাধান মার্ক্সবাদ। তাই একটা দেশে একটা যথার্থ মার্ক্সবাদী দলের নেতৃত্বে সমাজ পরিবর্তনের লড়াই ছাড়া সমাজমুক্তি অসম্ভব।

এই অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে ফ্যাসিবাদের বিলোপ ঘটেনি, ফ্যাসিবাদ পিছু হটেছে মাত্র। বিরাজমান ব্যবস্থা পরিবর্তনের কোনও অ্যাজেন্ডা এই গণঅভ্যুত্থানের ছিল না। রাষ্ট্রের নানা গণতান্ত্রিক সংস্কারের দাবি এই অভ্যুত্থান পরবর্তীতে উঠেছে। কারণ আওয়ামী লীগের ১৬ বছরের শাসনে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলো একেবারে নিঃশেষ হয়ে গেছে। এই গণতান্ত্রিক সংস্কার অপরিহার্য, তাতে দেশের গণতান্ত্রিক প্রথা ও প্রতিষ্ঠান কিছুটা পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হতে পারে, কিন্তু তাতে ফ্যাসিবাদের সম্পূর্ণ উচ্ছেদ সম্ভব নয়। এই পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার উচ্ছেদ না ঘটিয়ে ফ্যাসিবাদের উচ্ছেদ সম্ভব নয়। তা না হলে অনেক আত্মত্যাগের মাধ্যমে বারবার ভোটের অধিকার, মতপ্রকাশের অধিকার অর্জিত হবে আর গণআন্দোলনের শক্তি দুর্বল হলে, আন্দোলনের নেতৃত্ব পুঁজিপতি-শিল্পপতিদের দলগুলোর হাতে থাকলে, বারবারই তা হাতছাড়া হবে। আবারও নেমে আসবে নির্মম গণতন্ত্রহীন পরিবেশ। তাই কোন পথে ফ্যাসিবাদবিরোধী আন্দোলন প্রকৃত অর্থেই সফল হতে পারে সেটা নির্ধারণ করা ও সে পথে সংগ্রাম পরিচালনা করা গুরুত্বপূর্ণ। এটাই আমাদের দলের কাছে ধারাবাহিকভাবে ১৯৫২ সাল থেকে ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান, এরপর একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ পেরিয়ে আবার ১৯৯০-এর গণঅভ্যুত্থান এবং এরই ধারাবাহিকতায় ২০২৪-এর গণঅভ্যুত্থানের চেতনা।

ঘোষণাপত্রকে কেন্দ্র করে আমাদের আলোচনা আমরা রাখলাম। আমরা মনে করি, সকল রাজনৈতিক দল, ছাত্র সংগঠন, অভ্যুত্থানে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন শ্রেণি পেশার সংগঠন ও সর্বোপরি নাগরিক সমাজের সুচিন্তিত মতামত নিয়ে ঐকমত্যের মাধ্যমেই ঘোষণাপত্র চূড়ান্ত করা উচিত।

৫ আগস্ট ২০২৪ তারিখে গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে শেখ হাসিনা ক্ষমতাচ্যুত হয়। গত ৮ আগস্ট অর্থাৎ ৫ মাস আগে এই অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ক্ষমতায় আসে। এই সরকারের কাছে আমাদের প্রত্যাশা অনেক। কারণ আমাদের দলও এই গণঅভ্যুত্থানের অংশীদার। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, অন্তর্বর্তীকালীন সরকার জনজীবনের বিভিন্ন জ্বলন্ত সমস্যা সমাধানে যথার্থ পদক্ষেপ নিতে সক্ষম হয়নি। এমতাবস্থায় উল্লেখিত দাবিগুলো সরকার অবিলম্বে কার্যকর করবে বলে প্রত্যাশা করছি।

মেদিনীপুরে বিপ্লবী সূর্য সেনের মূর্তি প্রতিষ্ঠা

১২ জানুয়ারি ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের আপসহীন ধারার বিপ্লবী মাস্টারদা সূর্য সেনের প্রয়াণ দিবসে মেদিনীপুর শহিদ প্রশস্তি সমিতির উদ্যোগে তাঁর একটি আবক্ষ মূর্তি স্থাপিত হল মেদিনীপুর কলেজ সংলগ্ন শহিদ সরণিতে। মূর্তির আবরণ উন্মোচন করেন স্বাধীনতা সংগ্রামী চিত্তরঞ্জন সামন্ত। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সমিতির সভাপতি অধ্যাপক সুরেশ চন্দ্র দাস। বিধায়ক, পৌরসভার চেয়ারম্যান, মহকুমাশাসক সহ এলাকার বহু বিশিষ্টজন উপস্থিত ছিলেন। স্বাধীনতা আন্দোলনে বিপ্লবীদের ভূমিকা এবং মাস্টারদার সংগ্রামী জীবনের বহু দিক আলোচনা করেন অধ্যাপক মঙ্গল কুমার নায়েক।

নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু স্মরণে

কলকাতা হাইকোর্টে নেতাজি স্মরণ ঃ কলকাতা হাইকোর্টে লিগাল সার্ভিস সেন্টারের উদ্যোগে ২৩ জানুয়ারি নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন প্রাক্তন অ্যাডভোকেট জেনারেল বিশিষ্ট সিনিয়র ব্যারিস্টার অনিন্দ্য মিত্র ও জয়ন্ত মিত্র। এ ছাড়াও মাল্যদান করেন সিনিয়র অ্যাডভোকেট ঋজু ঘোষাল, পীযূষ চতুর্বেদে, হাইকোর্ট বারের প্রাক্তন সম্পাদক বিশ্বব্রত বসু মল্লিক সহ বহু আইনজীবী, ল ক্লার্ক, ল স্টুডেন্ট সহ সাধারণ মানুষ।

আন্দামান ঃ ২৩ জানুয়ারি নর্থ আন্দামানের ডিগলিপুরে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর ১২৯তম জন্মদিন উদযাপন অনুষ্ঠান হয়। নর্থ আন্দামানের স্বদেশ গ্রামে, সাউথ আন্দামানের হ্যাভলক এবং লিটিল আন্দামানে অনুষ্ঠান হয়। পোর্টব্লেয়ার ও চোলদারিতেও নেতাজি জন্মদিন উদযাপন হয়। এডুকেশন অ্যান্ড কালচারাল অর্গানাইজেশনের পক্ষ থেকে মোট চারটি আইল্যান্ড জুড়ে অনুষ্ঠান হয়। ডিগলিপুরের অনুষ্ঠানে প্রধান আলোচক ছিলেন অর্গানাইজেশনের উপদেষ্টা বলরাম মান্না। আন্দামান-নিকোবর আইল্যান্ডস জুড়ে দক্ষিণ এবং উত্তর আন্দামান জেলার মোট চারটি দ্বীপে আটটি অনুষ্ঠান হয়।

রাজস্থান ঃ রাজস্থানের জয়পুরে সিআরপি কলোনিতে এআইডিএসও, এআইডিওয়াইও এবং এআইএমএসএস-এর উদ্যোগে ২৩ জানুয়ারি নেতাজি জন্মজয়ন্তীর সমাপনী অনুষ্ঠান হয়। বক্তব্য রাখেন কমরেড কুলদীপ সিং, এআইএমএসএসের ইনচার্জ কমরেড রচনা, এআইডিএসও-র ইনচার্জ কমরেড মনু। প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন এস ইউ সি আই (সি) রাজ্য প্রস্তুতি কমিটির সদস্য কমরেড শঙ্কর দহিয়া। দেশাত্মবোধক গান এবং 'খুদা হাফিজ' নাটক পরিবেশিত হয়।

মধ্যপ্রদেশ ঃ মধ্যপ্রদেশের মহারাজ বাড়েতে ২৫ জানুয়ারি নেতাজি ইয়াদগার কমিটির উদ্যোগে জন্মজয়ন্তী অনুষ্ঠিত হয়। বক্তব্য রাখেন কমিটির মধ্যপ্রদেশ রাজ্য সম্পাদক রচনা আগরওয়াল। এ ছাড়া বক্তব্য রাখেন রূপেশ জৈন। পরিচালনা করেন শ্রুতি শিবহরে।

ভজুডি কোল ওয়াশারির শ্রমিকদের জয়

পুরুলিয়ার সাঁতালডিতে কেন্দ্রীয় সরকারি সংস্থা ভজুডি কোল ওয়াশারিতে একসময় সাতশোরও বেশি স্থায়ী শ্রমিক কাজ করতেন। কর্তৃপক্ষ ধীরে ধীরে সমস্ত পদে ঠিকা শ্রমিক নিয়োগ শুরু করে। পরে সম্পূর্ণ বেসরকারিকরণের লক্ষ্যে কর্তৃপক্ষ কারখানার উৎপাদন বন্ধকরে দেয় এবং লাগোয়া জমির উপর নতুন ওয়াশারি গড়ে তোলে। সেখানে উৎপাদনের দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে একটি বেসরকারি কোম্পানিকে। এই কোম্পানি কোলিয়ারিগুলিতে ঠিকাদারের কাজ করে। দীর্ঘদিন ধরে এরা কর্মচারীদের ন্যায্য মজুরি ও অন্যান্য প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করে চলেছে, যার বিরুদ্ধে একমাত্র এআইইউটিইউসি ধারাবাহিক আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে।

ভজুডির পুরনো ওয়াশারির উৎপাদন বন্ধকরে দিয়ে কর্তৃপক্ষ দীর্ঘদিন ধরে সেখানকার শ্রমিকদের বেতন বন্ধ করে রাখে এবং নতুন ওয়াশারিতে তাদের নিয়োগের দাবি মানতে অস্বীকার করে। অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদেরও সমস্ত প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত রাখে তারা। এই পরিস্থিতিতে পুরনো ওয়াশারির ঠিকা শ্রমিকরা যৌথমঞ্চ গড়ে তুলে গত ১১ নভেম্বর থেকে কারখানার গেটে লাগাতার ধরনা অবস্থান শুরু করেন। কর্তৃপক্ষ কর্ণপাত না করায় ১৪ জানুয়ারি থেকে তাঁরা রেললাইন অবরোধ করেন। এতে নতুন কারখানায় কয়লা প্রবেশ বন্ধ হয়ে যায়। দাবি পূরণে কর্তৃপক্ষের মৌখিক আশ্বাসে রাজি না হয়ে শ্রমিকরা লিখিত চুক্তির দাবিতে অবরোধ চালাতে থাকেন। জেলা প্রশাসন হস্তক্ষেপ করেও অবরোধ তুলতে ব্যর্থ হয়। শেষে ১৫ জানুয়ারি ধানবাদ কয়লা ভবনে বিসিসিএল কর্তৃপক্ষ এবং এআইইউটিইউসি এবং সিআইটিইউ নেতৃত্বের উপস্থিতিতে লিখিত চুক্তি হয়। কর্তৃপক্ষ সমস্ত দাবি মানতে বাধ্য হয়।

যৌথমঞ্চের এই আন্দোলনে সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রমিকের প্রতিনিধিত্বকারী এআইইউটিইউসি অনুমোদিত ইউনিয়ন দীর্ঘদিন ধরে অত্যন্ত বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেছে। এলাকার সাধারণ মানুষও এই আন্দোলনের সমর্থনে সোচ্চার হয়েছেন। ইউনিয়নের পক্ষ থেকে কমরেড প্রবীর মাহাতো এবং অশোক তেওয়ারি জয় ছিনিয়ে আনার জন্য সমস্ত আন্দোলনকারী কর্মচারীদের সংগ্রামী অভিনন্দন জানান।

গণদাবীর পাঠক বাড়ছে

দক্ষিণ ২৪ পরগণায় ক্যানিং সাংগঠনিক জেলার বাসন্তী ব্লকের সরবেড়িয়ার গ্রামে বাড়ি বাড়ি চলছিল গণদাবী মহামিছিল সংখ্যা বিক্রি। প্রতিটি বাড়িতে গণদাবী নেয়। আর জি করের ঘটনায় কেন্দ্র ও রাজ্যের পরামর্শে মূল অভিযুক্তকে আড়াল করা, ন্যায়বিচার না পাওয়া এগুলি সাধারণ মানুষের বুঝতে অসুবিধা হয়নি। দলের আন্দোলনের প্রতি মানুষের প্রবল আস্থা আছে। এসইউসিআই(সি) কিছু করতে পারে বলে মানুষের বিশ্বাস। অতি অল্প সময়ে ৮০টি গণদাবী বিক্রি হয়। দু'জন গণদাবীর নতুন গ্রাহক হন। আরও তিন জন গ্রাহক হবেন বলে জানান।

বিজেপি সরকারের কৃষক বিরোধী কর্পোরেট স্বার্থবাহী নীতির বিরুদ্ধে

শহিদ মিনারে কৃষক সমাবেশের ডাক

বিজেপি সরকারের কৃষি ও কৃষক বিরোধী এবং কর্পোরেট স্বার্থবাহী নীতির বিরুদ্ধে ২৫ ফেব্রুয়ারি শহিদ মিনার ময়দানে কৃষক ও গ্রামীণ মজুর মহাসমাবেশের ডাক দিয়েছে এআইকেকেএমএস।

সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক কমরেড গোপাল বিশ্বাস বলেন, আমাদের দেশের কৃষক ও খেতমজুর জীবন ভয়াবহ অবস্থার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। সার বীজ কীটনাশক ইত্যাদি কৃষি উপকরণের দাম লাফিয়ে বাড়ছে কিন্তু চাষি তার ফসলের লাভজনক দাম পাচ্ছে না। ঋণভারে জর্জরিত কৃষক আত্মহত্যা করতে বাধ্য হচ্ছে। কৃষকদের উচ্ছেদ করে জল-জমি-জঙ্গল কর্পোরেটের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে। ফসলের উৎপাদন খরচের দেড়গুণ (সি ২ প্লাস ৫০ শতাংশ) হারে এমএসপির দাবিতে চাষিরা দীর্ঘদিন লড়াই করছে।

কংগ্রেস সরকারের মতো বিজেপি সরকারও এই দাবি মানছে না। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেছিলেন ২০২২ সালের মধ্যে কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করা হবে। বাস্তবে চাষির আয় তো বাড়েইনি বরং ঋণের বোঝা আরও ভারী হচ্ছে। নয়া বিদ্যুৎ বিল আনা হয়েছে ক্ষেত্রটি কর্পোরেটের হাতে তুলে দিতে এবং প্রিপেড স্মার্ট মিটার চালু করা হচ্ছে গ্রাহকদের লুটতে। খেতমজুরদের বছরে দু-তিন মাসের বেশি কাজ থাকে না। কাজের সন্ধানে ঘরবাড়ি ছেড়ে দূর দেশে চলে যেতে হয়। এনরেগা প্রকল্পে ১০০ দিনের কাজও সরকার বন্ধ করে দিয়েছে। কেন্দ্রের বিজেপি সরকার ও বিভিন্ন রাজ্যের সরকারগুলো সংকটগ্রস্ত পুঁজিবাদকে বাঁচানোর লক্ষ্যে কর্পোরেট স্বার্থবাহী নীতি অনুসরণ করে সমস্ত সংকটের বোঝা কৃষক-খেতমজুর সহ সাধারণ মানুষের উপর চাপিয়ে দিচ্ছে।

দিল্লিতে কৃষকরা ঐতিহাসিক লড়াই করে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকে তিনটি কালা কৃষি আইন বাতিল করতে বাধ্য করেছিল। কিন্তু বিজেপি সরকার কর্পোরেট প্রভুদের সেবা করার জন্য পিছন দরজা দিয়ে আবারও ভয়ঙ্কর সেই কৃষিনীতিকেই ফিরিয়ে আনতে চাইছে। গত ২৫ নভেম্বর জাতীয় কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রণালয় 'ন্যাশনাল পলিসি ফ্রেমওয়ার্ক অন এগ্রিকালচারাল মার্কেটিং'— এই শিরোনামে একটা খসড়া নীতি নিয়ে এসেছে, যা তিনটি কালা কৃষি আইনের চেয়েও ভয়ঙ্কর। এই বিলে বলা হয়েছে, কৃষি বিপণনের জন্য দেশের এপিএমসি মান্ডি সহ সমস্ত গ্রামীণ হাট কর্পোরেটের নিয়ন্ত্রণে দেওয়া হবে, চুক্তিচাষ আইনসিদ্ধ করা হবে। এক কথায় চাল, গম, ডাল, মাছ-মাংস-দুধ সহ সমস্ত কৃষিপণ্য কর্পোরেটের নিয়ন্ত্রণে চলে যাবে। এর ফলে সমস্ত খাদ্যদ্রব্যের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি হবে। চাষিরা কোম্পানির গোলামে পরিণত হবে, কোটি কোটি মানুষ জীবিকা হারাবে।

তাহলে উপায় কী? উপায় একটাই, কৃষক খেতমজুরদের সংগঠিত করে দীর্ঘস্থায়ী প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলা। এই লক্ষ্য সামনে রেখে এ আই কে কে এম এস গ্রামে গ্রামে কৃষক খেতমজুরদের সংগ্রামের হাতিয়ার গ্রাম কমিটি গড়ে তুলছে। এই আন্দোলনকে আরও শক্তিশালী করতে আগামী ২৫ ফেব্রুয়ারি দেশের ১৮টি রাজ্যের রাজধানীতে ব্যাপক কৃষক ও গ্রামীণ মজুরদের সমাবেশ অনুষ্ঠিত হবে। ওই দিন কলকাতার শহিদ মিনার ময়দানে বেলা ২ টায় এক মহাসমাবেশের আহ্বান করা হয়েছে। এই মহাসমাবেশ সফল করার জন্য রাজ্যের সমস্ত কৃষক, গ্রামীণ মজুর সহ সর্বস্তরের মানুষের কাছে আহ্বান জানিয়েছে সংগঠন।

কৃষক ও গ্রামীণ মজুর মহাসমাবেশ

শহিদ মিনার ময়দান • ২৫ ফেব্রুয়ারি • বেলা ২টা

প্রধান বক্তা – **কমরেড শংকর ঘোষ,** সাধারণ সম্পাদক, বক্তা – **কমরেড গোপাল বিশ্বাস,** রাজ্য সম্পাদক

সভাপতি – **কমরেড পঞ্চানন প্রধান, রাজ্য সভাপতি**

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2025-27
গণদাবী GANADABI Volume: 77, No.: 25 Bengali Weekly January 31, 2025 Kolkata Price: Rs. 3.00

তোমাদের দেখে সাহস পাচ্ছি

২১-এর মিছিলের প্রস্তুতির কাজ করতে করতেই স্বপ্ন দেখছিলাম— প্রায় পঞ্চাশ হাজার মানুষের মিছিল হেঁটে যাবে। গ্রামগঞ্জ থেকে হাজার হাজার মা, বোন, ছাত্র ভোররাতে, কেউ বা আগের দিন ট্রেন ধরে কলকাতায় আসবে, কৃষক জমিতে ফসল ফেলে, শ্রমিক কাজ বন্ধ রেখে আসবে মিছিলে। হাজার হাজার মুষ্টিবদ্ধ হাত স্লোগান তুলবে— দাবি করবে অভয়ার বিচার চেয়ে। লাল টুকটুকে পতাকায় ছেয়ে যাবে কলকাতা, 'মিছিল নগরী' একদৃষ্টিতে চেয়ে থাকবে সেই মিছিলের দিকে। মনে পড়বে তার অতীত গৌরবের কথা। যে লাল পতাকার মিছিলে মিশে আছে সংগ্রামের অনেক ইতিহাস।

মালিকদের সংবাদপত্রগুলি শ্রমিক-কৃষকের মিছিল নিয়ে এতদিন লিখত— '... মিছিলে স্তব্ধ শহরের রাস্তায় প্রবল যানজটে নাকাল মানুষ'। জানতাম, এবারও তার ব্যতিক্রম ঘটবে না। কেউ বা মিছিলের সামনের একফালি ট্যাবলোর ছবি দিয়ে আড়াল করতে চাইবে জনসমুদ্রের মহামিছিলকে। কোথাও জায়গা পাবে কলকাতা সংস্করণের এক কোণে ছোট্ট করে। কেউ 'নাগরিক মিছিল' বলে উল্লেখ করবে, কিন্তু দলের নাম মনে পড়বে না।

আর সাধারণ মানুষ সংবাদপত্রগুলির এই ভূমিকা দেখে হতবাক হবেন। অনেকে, যাঁরা হয়তো মিছিলে আসতে পারেননি, যাঁরা দূর থেকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন মিছিল সুন্দর হোক, যাঁরা দু'হাত ভরে তুলে দিয়েছেন অর্থ, তাঁরা শুক্রবারের মুখ চেয়ে থাকবেন— কবে 'গণদাবী' আসবে। এদেরই একজন হয়তো সেই দিদিটি, শিয়ালদহ থেকে ব্যারাকপুরগামী ট্রেনে একজনকে গণদাবী দিতেই যিনি তিনটি টাকা বাড়িয়ে দিয়ে বললেন— আমাকেও একটি দাও।

কাগজ হাতে পেয়ে 'এ মিছিল প্রেরণার, এ মিছিল আস্থার' হেডিংয়ের তলায় জনসমুদ্র দেখে নিয়ে আবেগঘন দৃষ্টিতে বলে গেলেন 'লড়াই আন্দোলন করেও তো কিছুই পেলাম না, কিছু হবে কিনা জানিও না। কিন্তু তোমরা এখনও লড়ে যাচ্ছ দেখে সাহস পাচ্ছি। থেমে যেও না তোমরা।'

কানু মণ্ডল
রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

অভয়াকাণ্ডের রায় বিচারের নামে প্রহসন

প্রভাস ঘোষ

অভয়া কাণ্ডে শিয়ালদহ কোর্টের রায় প্রসঙ্গে ১৮ জানুয়ারি এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ বলেন, যা আশঙ্কা করা গিয়েছিল সেই মতোই, শিয়ালদহ কোর্ট অভয়ার ধর্ষণ ও হত্যাকাণ্ডে শুধুমাত্র একজন সিভিক ভলান্টিয়ারকে দোষী করে রায় দিয়েছে। অর্থাৎ ঘটনার পাঁচ মাস কেটে যাওয়ার পর এই ভয়ঙ্কর অপরাধের জন্য একজন মাত্র সিভিক ভলান্টিয়ারকে দায়ী করে একটি মামুলি রায় দেওয়া হল। এই রায় বিচারপ্রক্রিয়ার প্রহসন ছাড়া কিছু নয়, যা থেকে বোঝা যায়, অদৃশ্য কোনও সুতোর টান এখানে কাজ করেছে যাতে প্রকৃত দোষীরা ছাড়া পেয়ে যায়। এও বোঝা যাচ্ছে যে, কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন সিবিআই চেষ্টা করেছে সত্যকে চাপা দিতে এবং রাজ্য সরকারের বক্তব্যের উপরেই সিলমোহর দিয়েছে।

আমরা এই ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি এবং সাধারণ মানুষ ও চিকিৎসার সঙ্গে যুক্ত মানুষজনকে ন্যায়বিচার ও প্রকৃত দোষীদের শাস্তির দাবিতে আন্দোলন আরও তীব্র করার আহ্বান জানাচ্ছি, যাতে প্রকৃত দোষীরা ধরা পড়ে ও কঠোর শাস্তি পায়।

ভাইকে গিয়ে দেখাবো কত বড় মিছিল

শুধুই কি অভয়ার বিচার না পাওয়ার কান্না? এই মিছিলে এসে মিশেছে প্রতিটি ছাত্রের কৃষকের শ্রমিকের মহিলার নিত্যদিনের কান্নার বিপরীতে করুণাভিক্ষা নয়, দাবি আদায়ের বলিষ্ঠ আওয়াজ। ছাত্ররা ঐক্যবদ্ধ হয়েছেন সরকারি শিক্ষা বাঁচানোর দাবিতে আগামী প্রজন্মকে নবজাগরণের মনীষীদের স্বপ্নের পরিপূরক, আগামী সমাজের যোগ্য পরিচালক করার শিক্ষা আদায়ের অধিকারে।

শ্রমজীবী থেকে বুদ্ধিজীবী— কে নেই এই মিছিলে? প্রতিটি মানুষের দাবি নিয়ে মিছিল এগিয়ে চলেছে। মনে হচ্ছে যেন এ মিছিল পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি মানুষের আকুতি নিয়ে প্রতিটি মানুষের পাওয়া, না পাওয়া, চাওয়া সবকিছু নিয়ে শাসকের সাথে একটা চরম বোঝাপড়া করে নিতে চলেছে।

দেখে মনে হচ্ছে, এ পথ হাঁটায় তাদের যেন কোনও ক্লান্তি নেই, বরং সুখ, বরং আনন্দ। আনন্দের এই প্রতিবাদ উৎসবে প্রিয়জন আসতে পারেনি বলে অনেকে ভিডিও কলে দেখাচ্ছেন মিছিল। কোথায় কল করছেন? জিজ্ঞেস করলে উত্তর আসে— ওর শরীরটা খারাপ বলে আজ আসতে পারল না, ওকে দেখাচ্ছি। একজন বয়স্ক মহিলা ছবি তুলে দিতে বললেন। তাঁর কথায়— আমি ভাইকে গিয়ে দেখাব কত বড় মিছিল! সম্মিলিত এই জনপ্লাবন যেন কানে কানে জাগরণের বার্তা দিয়ে যায়।

এই জনপ্লাবনের সংবাদ সাংবাদিকরা দিতে চাইলেও মালিকপক্ষ ও সরকারি বাধা-নিষেধের বেড়া টপকে এ খবর তাঁরা প্রকাশ করতে পারবেন না, কিন্তু প্রাণে প্রাণে জাগরণ সৃষ্টিকারী এই মিছিলের বার্তা নিয়ে যে মানুষগুলো ফিরে গেছে আবার তাদের নিজ নিজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এলাকায় কর্মক্ষেত্রে তারা একে আরও দ্বিগুণভাবে সঞ্চারিত করবে।

তনুশ্রী বেজ, পশ্চিম মেদিনীপুর

ট্রাম চালুর দাবিতে বুদ্ধিজীবীদের সভা

কলকাতা থেকে ট্রাম পরিবহন তুলে দিতে রাজ্য সরকারের ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদে যে আন্দোলন চলছে তারই অঙ্গ হিসাবে ক্যালকাটা ট্রাম ইউজারস অ্যাসোসিয়েশন ছোটদের আঁকা, গান, নাচ প্রভৃতির মধ্য দিয়ে প্রতিবাদের উদ্যোগে নিয়েছিল, ১৯ জানুয়ারি, রানু ছায়া মঞ্চ, রবীন্দ্রসদন চত্বরে।

এই উপলক্ষে অনুষ্ঠিত সভায় প্রাক্তন সাংসদ ও নাগরিক প্রতিরোধ মঞ্চের আহ্বায়ক ডাঃ তরুণ মণ্ডল বলেন, শরীরের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ যদি অহেতুক কেটে বাদ দেওয়া হয়, তা হলে সেই শরীর যেমন অকেজো হয়ে যায় তেমনই এই শহরের বুক থেকে ট্রাম পরিষেবা বন্ধ করলে তা হবে একটি আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত। তিনি বলেন, ট্রামকে ধ্বংস করার চেষ্টা আগের সরকারের আমল থেকেই শুরু হয়েছিল।

ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ কেমিক্যাল বায়োলজির প্রাক্তন অধ্যাপক ও অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি দেবাশীষ ভট্টাচার্য বলেন, পরিবেশ দূষণের হাত থেকে রেহাই পেতে বিশ্বের বহু দেশ আবার ট্রাম ফিরিয়ে আনছে। অথচ কলকাতায় ট্রাম পরিকাঠামো শহরের প্রান্তে প্রান্তে জালের মতো ছড়িয়ে থাকলেও তাকে কুযুক্তি দিয়ে তিল তিল করে ধ্বংস করা হচ্ছে।

বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত ঘোষণা করেন— ট্রাম তুলে দেওয়ার একমাত্র কারণ ট্রাম ডিপোগুলোর লোভনীয় জমি। সরকারি পরিবহণ বলতে শহরে প্রায় কিছুই নেই। তিনি আক্ষেপের সঙ্গে বলেন, সরকার বদলায় কিন্তু দুর্নীতির শুধু হাত বদল হয়। রানুছায়া মঞ্চে উপস্থিত যুব সমাজের উদ্দেশে তিনি বলেন, এই ৯০ বছর বয়সেও ট্রামের আন্দোলনে যখন যেখানে আপনারা ডাকবেন আমি আপনাদের সঙ্গে আছি।

এ ছাড়াও এ দিনের সভায় উপস্থিত ছিলেন অমিতাভ বন্দ্যোপাধ্যায়, পরাশর বন্দ্যোপাধ্যায় সহ শিল্পী সাংস্কৃতিক কর্মী ও বুদ্ধিজীবী মঞ্চের অন্যতম সম্পাদক দিলীপ চক্রবর্তী। সকলেই পরিবেশ বান্ধব ট্রাম ব্যবস্থাকে বাঁচাতে নাগরিকদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

কলকাতা বইমেলায় গণদাবী স্টলে পাওয়া যাচ্ছে

স্টল নং - ৫৬২

Editor : Amitava Chatterjee ▪ Published by Amitava Chatterjee on behalf of SUCI (C), West Bengal State Committee from 48 Lenin Sarani, Kolkata 13 ▪ Printed by Soumen Basu at: Ganadabi Printers and Publishers Pvt. Ltd. 52B Indian Mirror Street, Kolkata-13 ▪ Phone: 9433451998, 9432889347 ▪ E-mail: ganadabi@gmail.com ▪ Web: https://ganadabi.com